দারসে কুরআন সিরিজ-১৪

মহাশূণ্যে সব-ই ঘুরছে

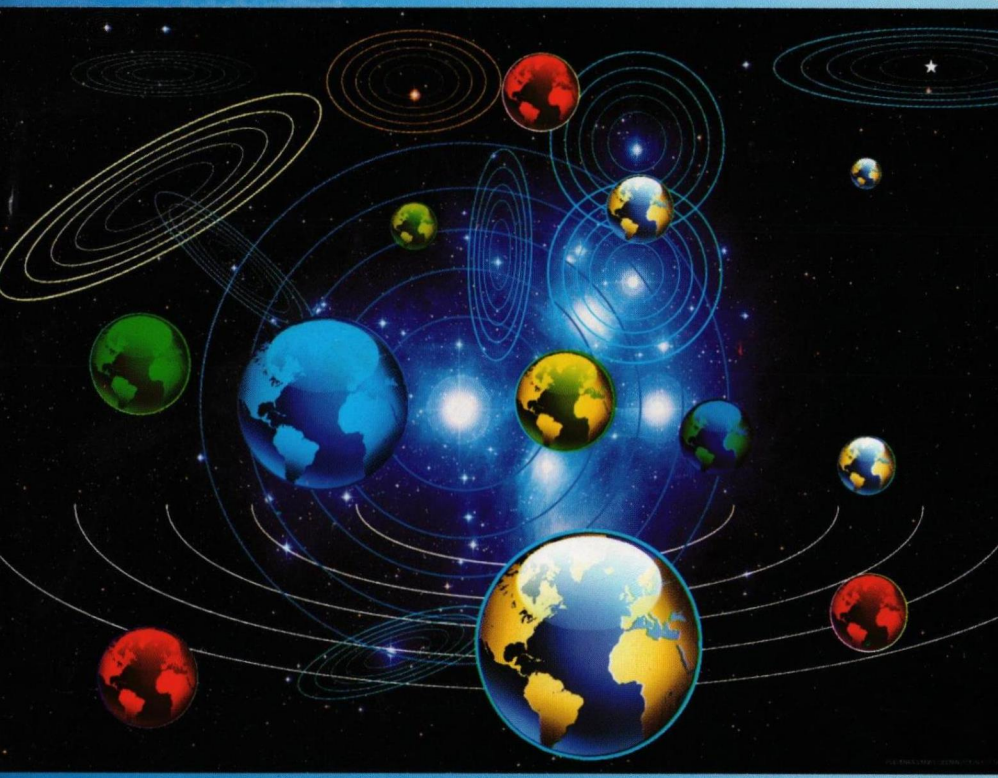

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

দারসে কুরআন সিরিজ– ১৪

মহাশূন্যে সব-ই ঘুরছে

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট, ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল: ০১৭১১-৯৬৬২২৯, ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫

www.pathagar.com

মহাশূন্যে সব-ই ঘুরছে

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

প্রকাশক: **খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির**
খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট, ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল: ০১৭১১-৯৬৬২২৯

প্রকাশকাল: প্রথম সংস্করণ, ১৯৮২ ইং
পঁচিশতম প্রকাশ, জুন- ২০১৪ ইং

গ্রন্থস্বত্ব: প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত,

প্রচ্ছদ: আনোয়ার হোসেন খান

মুদ্রণ: আল-আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬, শিশির দাস লেন, ঢাকা

মূল্য: **৫০/- (পঞ্চাশ টাকা মাত্র)**

www.pathagar.com

দিন ও রাত হওয়ার কারণ সম্পর্কে দু'টি কথা

পৃথিবী ঘুরে দিন ও রাত হয়, না সূর্য ঘুরে দিন ও রাত হয়–বিষয়টি এই বিংশ শতাব্দীতে একটা বিতর্কিত বিষয় হয়ে রয়েছে। বহু শিক্ষিত মগজে আজও এ সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা বিদ্যমান। আমরা জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই শুনে আসছি বিজ্ঞানের মতে পৃথিবী ঘোরে, আর কুরআনের মতে সূর্য ঘোরে। বিজ্ঞানের কোনো কোনো ধারণা সত্যিই কুরআনবিরোধী। যেমন মানুষের আদি পূর্বপুরুষ সম্পর্কে বিজ্ঞানের ধারণা যে, 'বানর থেকে মানুষের জন্ম হয়েছে।' এ ধারণা অবশ্যই সত্যবিরোধী। তাই বলে বিজ্ঞান যা বলবে তা-ই সত্য বিরোধী হবে এটা কোনো যুক্তির কথা নয়।

দিন ও রাত হওয়া সম্পর্কে বিজ্ঞান ও কুরআনে যে মতবিরোধের কথা শোনা যায় তা কি বাস্তব, না কৃত্রিম, তা প্রামাণ্য দলিল দ্বারা খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়নি। বর্তমান যুগশ্রেষ্ঠ আলেমদের পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে জোরালোভাবে কিছুই বলতে শুনি না।

'সূর্য ঘুরে দিন ও রাত হয়'–এ মতের সপক্ষে বৈজ্ঞানিক যুক্তিসহ বইও বের হয়েছে। সে বইয়ের উপরও কাউকে কোনো মন্তব্য করতে শুনি না। এর ফলে এ বিষয়ের অস্পষ্টতা বাড়ছে ছাড়া কমছে না। আমি এসব অস্পষ্টতা দূর করার উদ্দেশ্যে এ বইটি লিখেছি। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, এরপর থেকে দিন ও রাত হওয়ার কারণটা হয়তো আর কোনো বিতর্কিত বিষয় থাকবে না। সত্যের সপক্ষে আল-কুরআনের আলোকে এতে এমন অকাট্য যুক্তি পেশ করা হয়েছে যার পাল্টা যুক্তি এখনো আবিষ্কার হয়েছে কি না তা পাঠকগণই যাচাই করবেন।

এর তৃতীয় সংস্করণে আরো কিছু আয়াত ও কিছু অতিরিক্ত কথা যোগ করা হয়েছে যেন এ সম্পর্কিত ধারণা আরো স্পষ্ট হয়।

ইতি–

গ্রন্থকার

www.pathagar.com

সূচীক্রম

০১. মহাশূন্যে সব-ই ঘুরছে ০৫
০২. আল্লাহর কুল-মাখলুক সৃষ্টির গোড়ার কথা ০৮
০৩. আমাদের ভৌগোলিক জ্ঞান ০৯
০৪. 'পৃথিবী নয়, সূর্য ঘোরে' বইয়ের প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল এবং সমাজের সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা ১১
০৫. পৃথিবীর গতিশীলতা সম্পর্কে অতীতকালের ধারণা ১২
০৬. পৃথিবীর গতিশীলতা সম্পর্কে আলেমগণের ধারণা ১৪
০৭. সাবেক মত ও পাল্টা যুক্তি ১৫
০৮. আল-কুরআনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গ ২৮
০৯. 'কুললুন ফি ফালাকিইঁ ইয়াসবাহুন' থেকে পৃথিবী ঘোরার কথাও বুঝানো হয়েছে-এর সপক্ষে আমার যুক্তি ২৮
১০. পৃথিবীর চলার পথ বৃত্তাকার নয়, ডিম্বাকার ৩৬
১১. গতিশীলতার ধর্ম ও তার ফলাফল ৩৮
১২. পৃথিবীর দুই মেরু অঞ্চলের অবস্থা ৪২
১৩. উপর ও নিচ-এর হাকীকত ৪৬
১৪. 'মাধ্যাকর্ষণ শক্তি' সম্পর্কে আল-কুরআন ৪৭
১৫. বৃষ্টিপাত ও বায়ুপ্রবাহ ৪৯
১৬. বিদ্যুৎ ও মেঘের ডাক ৫৩
১৭. বিদ্যুতের হাত থেকে বাঁচার উপায় ৫৬
১৮. জোয়ার-ভাটা ৫৬
১৯. সৌরজগৎ ৫৮
২০. পৃথিবীর বেড় ও আয়াতন ঃ মাপার উপায় ৬০
২১. পৃথিবীর বার্ষিক গতি ৬২

www.pathagar.com

মহাশূন্যে সব-ই ঘুরছে

মহাশূন্যে যে সবকিছুই আপন আপন কক্ষপথে ঘুরতেছে সে সম্পর্কে পবিত্র আল-কুরআনের বাণী ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ط ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ- وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ - لَاالشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ط وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ - (رسوره يس)

অর্থ ঃ আর সূর্য তার গন্তব্যস্থলের দিকে ছুটে চলেছে। এটা মহাপরাক্রমশালী সুবিজ্ঞ সত্তার সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনা। আর চাঁদের মঞ্জিলসমূহও আমরা নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। এভাবে তা তাদের (মঞ্জিলসমূহের) উপর দিয়ে চলে গিয়ে শেষ পর্যন্ত খেঁজুরের শুষ্ক পুরাতন শাখার মতো হয়ে পড়ে। সূর্যের ক্ষমতা নেই যে সে চাঁদকে ধরে ফেলে আর না রাত দিনকে ছেড়ে এগিয়ে যেতে পারে। আর সবকিছুই মহাশূন্যের মধ্যে সাঁতার কাটছে বা গতিশীল অবস্থায় চলছে।

(সূরা ইয়াসিন ঃ ৩৮, ৩৯ ও ৪০)

শব্দার্থ ঃ وَالشَّمْسُ – এবং সূর্য। تَجْرِىْ – চলেছে। لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا – তার নিজের গন্তব্যস্থলের দিকে বা কক্ষপথে। ذٰلِكَ – এটা, ইহা। تَقْدِيْرُ – সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনা। الْعَزِيْزِ – মহাপরাক্রমশালী। الْعَلِيْمِ – সুবিজ্ঞ, মহাজ্ঞানী। وَالْقَمَرَ – এবং চাঁদও। قَدَّرْنٰهُ – আমরা নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। مَنَازِلَ – মঞ্জিলসমূহ, গন্তব্যস্থানসমূহ। حَتّٰى – যতক্ষণ না। عَادَ – হয়ে পড়ে। كَالْعُرْجُوْنِ – খেজুরের শুষ্ক শাখার মতো। الْقَدِيْمِ – পুরাতন। لَاالشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَا – সূর্যের কোনো

www.pathagar.com

ক্ষমতাই নাই যে। اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ – চাঁদকে ধরে ফেলে। وَ – এবং। لَا – না। اللَّيْلُ – রাত। سَابِقُ النَّهَارِ – দিনকে ফেলে এগিয়ে যেতে পারে। وَكُلٌّ – এবং সবকিছু, সব-ই। فِىْ – মধ্যে। فَلَكٍ – মহাশূন্যে। كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ – সাঁতরাচ্ছে, সাঁতার কাটছে। সব-ই মহাশূন্যে নিজ কক্ষপথে ঘুরছে।

ব্যাখ্যা ঃ বাস্তবে এগুলি হচ্ছে তাওহীদের পক্ষে অকাট্য দলিল। যার মধ্যে আমরা পাচ্ছি এমনকিছু তত্ত্ব ও তথ্য যা থেকে পৃথিবী, চাঁদ ও সূর্যের অবস্থান, এদের গতিশীলতা, গতিজড়তা, আকাশরাজ্যে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর অবস্থান, তাদের সুনির্দিষ্ট কক্ষপথে অতিক্রম করে অন্যত্র সরে নড়ে না যাওয়ার নিশ্চয়তা এবং দিন ও রাত সংঘটিত হওয়ার সুনির্ধারিত ব্যবস্থাপনার মূল হাকীকত।

এখানে একথাও সুস্পষ্টভাবে জানা গেল যে, সূর্য তার কক্ষপথে যখন দ্রুতগতিতে ছুটে চলছে তখন পরিবারের বা সৌরজগতের সকলকেই অর্থাৎ পৃথিবী, চাঁদ ও অন্যান্য-গ্রহ উপগ্রহ সবকিছুকে নিয়েই এমনভাবে ছুটে চলছে যে, কেউ কারো নির্ধারিত পথ ছেড়ে অন্য কারো পথে ঢুকে পড়তে পারবে না এবং পারবে না একটার সঙ্গে আরেকটার টক্কর লাগতে–যা একই সত্তার সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনা ছাড়া সম্ভব হতে পারে না।

ঐ একই বিষয়ের ২য় দলিল পাওয়া যায় সূরা আম্বিয়ার ৩৩ নম্বর আয়াতে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ -

অর্থ ঃ এবং তিনিই তো (আল্লাহ) যিনি সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সব.মহাশূন্যের মধ্যে ঘুরছে বা সাঁতরাচ্ছে।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে লক্ষণীয় যে, 'ইয়াসবাহুন' থেকে সাঁতরানোর মতো ঘোরা বুঝা যায় অর্থাৎ সমুদ্রে মাছ যেমন পানির উপর দিয়ে সাঁতরায়, তখন প্রতিনিয়ত তার অবস্থান পরিবর্তন করে। অর্থাৎ একটা মাছ সাঁতরানোর সময় না কোনো একই অক্ষাংশের উপর থেকে সাঁতরাতে পারে আর না কোনো একই দ্রাঘিমাংশের উপর থেকে সাঁতরাতে পারে। সে প্রতিনিয়ত

www.pathagar.com

স্থান পরিবর্তন করে সাঁতরায়। ঠিক তদ্রূপ আকাশে যা কিছুই আছে তা প্রতিনিয়ত ঘুরছে আর সাঁতরাচ্ছে অর্থাৎ স্থান পরিবর্তন করছে। উপরে বর্ণিত দু'টি স্থান থেকে পৃথিবীর আহ্নিক গতির দলিল পাওয়া যায়।

তাছাড়া নিম্নের ৩টি আয়াত থেকে পৃথিবীর বার্ষিক গতির দলিল পাওয়া যায়। যথা ঃ ১. সূরা রা'দের ২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ـ

অর্থ ঃ তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশমণ্ডলকে দেখার মতো কোনো খুঁটি ব্যতিরেকেই বহু উর্ধ্বে স্থাপন করেছেন। পরে তিনি নিজের সর্বোচ্চ আসনে আসীন হয়েছেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে একটা নিয়মের অধীন বানিয়ে দিয়েছেন। এই গোটা ব্যবস্থাপনার প্রত্যেকটি জিনিসই একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্তকার জন্য চলছে, চলবে ও চলতে থাকবে (এই নির্দিষ্ট সময় যখনই শেষ হয়ে যাবে তখনই কিয়ামত হবে)। আর আল্লাহ-ই এই সমস্ত কাজের ব্যবস্থা করছেন। তিনি (তার) নিদর্শনগুলি আলাদা আলাদাভাবে বর্ণনা করেন। যেন তোমরা তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাতের কথা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করতে পারো।

এ আয়াতে উল্লেখিত كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى শব্দগুলো থেকে বুঝাচ্ছে, পৃথিবী ও মহাশূন্যের সবকিছুসহ প্রতিনিয়ত তার কক্ষপথে ঘুরে চলছে এবং এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। এই চলার একটা নিয়ম আল্লাহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে নিয়মে পৃথিবী ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় একবার করে সূর্যের চারপাশ দিয়ে ঘুরে আসে। এর সমর্থনে সূরা লোকমানের ২৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ـ

www.pathagar.com

অর্থ ঃ তোমরা কি দেখো না, আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে নিয়ে আসেন আর দিনকে নিয়ে আসেন রাতের মধ্যে। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে (এক সুনির্দিষ্ট নিয়মে) নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন। সবকিছুই এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলছে (অর্থাৎ কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত)। আর (তোমরা কি জানো না যে) তোমরা যা কিছুই করছো আল্লাহ তার সবকিছুর খবর রাখেন।

এখানে মহাশূন্যের সবকিছুই যে চলছে তার ঐ একই দলিল পাওয়া গেল, যা পূর্বের আয়াতেও প্রায় একই ভাষায় বলা হয়েছে।

ঐ একই কথার সমর্থনে সূরা যুমারের ৫ম আয়াতে আল্লাহ বলছেন ঃ

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَكُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ط اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ـ

অর্থ ঃ তিনি আসমানসমূহ এবং পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন (অর্থাৎ মানানসইভাবে সৃষ্টি করেছেন যার মধ্যে অবৈজ্ঞানিক কোনো ব্যবস্থাপনাই নেই)। তিনি দিনের পর রাতকে এবং রাতের পর দিনকে পৌঁছাতে থাকেন (অর্থাৎ এমন ব্যবস্থা করেছেন যেন একটা বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় দিনের পর রাত এবং রাতের পর দিন হতে পারে)। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে এমনিভাবে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন যে, প্রত্যেকটিই নির্দিষ্ট নিয়মে চলতে থাকে। জেনে রাখো, তিনি প্রবল ও ক্ষমাশীল।

আল্লাহর কুল-মাখলুক সৃষ্টির গোড়ার কথা

সূরা হা-মীম আস-সাজদার ১১ ও ১২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْكَرْهًا ط قَالَتَآ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ ـ فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ وَ اَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ط وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ صلے وَحِفْظًا ط ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ـ (حم السجدة)

www.pathagar.com

অর্থ ঃ অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলের দিকে লক্ষ্য আরোপ করলেন। উহা তখন শুধু ধোঁয়া ছিল। তিনি আসমান ও জমিনকে বললেন, তোমরা অস্তিত্ব ধারণ করো ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক। উভয়ই বললো, আমরা অস্তিত্ব ধারণ করলাম অনুগতদের মতো। তখন তিনি দুই দিনের মধ্যে সাত আসমান বানিয়ে দিলেন। আর প্রতি আসমানে তার বিধি-বিধান অহী করা হলো। আর দুনিয়ার আসমানকে আমি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী দ্বারা সুসজ্জিত করলাম ও তাকে পূর্ণভাবে সুরক্ষিত করে দিলাম। এ সবকিছুই এক সুবিজ্ঞ মহাপরাক্রমশালীর পরিকল্পনা।

ব্যাখ্যা ঃ এখান থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, ১. সমস্ত কিছু সৃষ্টির পূর্বে আসমান-জমিন সবই ছিল একটা ধোঁয়ার কুণ্ডুলী মাত্র। ২. আল্লাহ্‌র হুকুমে যখন একই মূল বস্তু থেকে সবকিছুর সৃষ্টি তখন এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্র এ সব-ই একই মূল বস্তু থেকে সৃষ্ট। এছাড়া আমরা এখন সূরা ইয়াসিনের ৩৯ নম্বর আয়াত থেকে জানতে পারলাম যে, সূর্যের নিজস্ব পথে সূর্যও চলমান রয়েছে এবং আমাদের এ পৃথিবীও সূর্যের সঙ্গে তার দূরত্ব ঠিক রেখে সূর্যের সঙ্গে চলতেই আছে এবং চাঁদও পৃথিবীর চারপাশ দিয়ে ২৯½ দিনে একবার ঘুরছে এবং পৃথিবীর সঙ্গে চলছে যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা গতিজড়তার আলোচনায় পাওয়া যাবে।

আমাদের ভৌগোলিক জ্ঞান

মাদরাসা শিক্ষার উচ্চ শ্রেণীগুলিতে ভূগোলকে পাঠ্য না করার কারণে কুরআন পাকে যে-সকল ভৌগোলিক আয়াত রয়েছে তার ব্যাখ্যা বুঝতে আমরা অনেকেই ভুল করছি। আর যারা সামান্য কিছুটা ভূগোল পড়েছি তাদের অনেকেরই বিদ্যা ঐ মুখস্থ পর্যন্তই। কারণ গবেষণামূলক কোনো পাঠের ব্যবস্থা আমাদের এ সমাজে নেই। আমাদের অনেকেরই এমন ভৌগোলিক ধারণা যা কেউ কেউ ব্যক্ত করেন–যা শুনলে লজ্জিত হতে হয়। আমি এ ধরনের কয়েকটি উক্তি পেশ করছি।

এই সমাজেরই একজন ছাত্র তার শিক্ষককে বলেছিলেন–'স্যার, দশ টাকার জন্য যদি পৃথিবী ঘোরে তবে ঘুরুক, আমার মাথায় তা ঘুরবে না।'

আমি নামকরা এক বক্তাকে বলতে শুনেছি–'আমেরিকার লোকগুলির মাথা নাকি নিচের দিকে। এ কি করে সম্ভব, তা আমার মাথায় ধরে না।'

www.pathagar.com

অন্য এক বক্তাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন–'পৃথিবী বলের মতো গোল নয়, থালার মতো গোল।'

আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে যাদের কুরআন-হাদীসের জ্ঞান অপেক্ষাকৃত কম অথচ আল্লাহর প্রতি ঈমান আছে তাদেরকে যখন বলা হয় কুরআনে আছে, সূর্য ঘুরে দিন ও রাত হয়, তখন কুরআন যে সত্যিই আল্লাহর বাণী–একথা বিশ্বাস করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

কুরআন নিজে কারো সাথে কথা বলে না। যারা এর অনুসারী তারা কুরআনকে যেভাবে সমাজের সামনে তুলে ধরবেন সমাজ কুরআনকে সেভাবেই গ্রহণ করবে। বড়ই আফসোস যে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে আমরা কেউ কেউ চেষ্টা করছি বৃহৎ তাবিজাতের কিতাব হিসেবে সমাজের সামনে তুলে ধরতে।

কিন্তু কুরআন কি তাই? প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন কোনো দিক নেই যা আল-কুরআনে বর্ণিত হয়নি।[১]

আজ যদি কুরআনের উপর আমাদের গবেষণা থাকতো, তবে বিজ্ঞানীদের বলার বহু পূর্বে আমরাই বলে দিতে পারতাম যে, সূর্য নয় পৃথিবী ঘুরেই দিন-রাত হয়। এ বাহাদুরী কোপার্নিকাস ও গ্যালিলিও পেতো না–পেতাম আমরাই। যদি কুরআনে থাকে 'অপেক্ষা করো' আর আমি যদি ঐ কথাকে পড়ি 'উপেক্ষা করো' তাহলে সে দোষ কি কুরআনের হবে, না আমার হবে?

কুরআনের কোনো শব্দ যদি থাকে 'অনুরাগ' আর আমি যদি পড়ি 'রাগ' তাহলে সে দোষ কার ঘাড়ে চাপবে? সেই কুরআনে দিন-রাত হওয়ার কারণ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে আমরা করছি তারই উল্টো অর্থ। ফলে সে দোষটা গিয়ে চাপছে পবিত্র কুরআনের ঘাড়ে। আর আধুনিক শিক্ষিতদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছে যে, কুরআন যদি আল্লাহর বাণী হয় তাহলে তাতে কেন অবৈজ্ঞানিক কথা রয়েছে বা থাকবে!

আল-কুরআনের বিকৃত ব্যাখ্যা যা বাস্তবতাবিরোধী তা পেশ করে কুরআনের দিকে লোকদেরকে ফিরানো যাবে না বরং মানুষ কুরআন বিমুখই হয়ে উঠবে। তাই প্রয়োজন কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা পেশ করার ব্যবস্থা করা।

টীকা–১ ঃ কুরআন যদিও বিজ্ঞানের কোনো পুস্তক নয় তবু আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টিকৌশল বলতে গিয়ে এমন বহু কথাই কুরআনের মধ্যে বলেছেন যা বিজ্ঞানের দ্বার উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছে।

www.pathagar.com

'পৃথিবী নয়, সূর্য ঘোরে' বইয়ের প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল এবং সমাজের সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা

সাধারণ মুসলমানদের ঈমান খুব মজবুত। তারা যখন শুনেছে যে, কুরআনের মতে সূর্য ঘোরে, তখন তা অন্তরের মধ্যে এমনভাবে গেঁথে নিয়েছেন যে, কুড়াল মারলেও সে ঈমান আর নষ্ট হবে না। এরপর যখন স্কুলের ছাত্রদের নিকট শুনতে পায়, বইয়ে আছে–'সূর্য নয়, পৃথিবী ঘুরে দিন ও রাত হয়' তখন তাদেরকে মন্তব্য করতে শুনেছি–'ইস্ কি সর্বনাশ! এইসব বই মুসলমান ছেলেদেরকে একেবারে নাস্তিক বানিয়ে ফেললো।'

কিছু বই যে নাস্তিক বানাচ্ছে তা ঠিকই, কিন্তু এই কথায় কেউ নাস্তিক হচ্ছে না।

এরপর যখন শোনা গেল, 'সূর্য ঘুরে দিন ও রাত হয়'-এর পক্ষে বই বের হয়েছে তখন খবর শুনে সাধারণ মুসলমানদের মনে সে কি আনন্দ।

আমি এমনও বলতে শুনেছি, নামাযী লোকে একে অন্যকে বলছেন ঃ 'পৃথিবী নয়, সূর্য ঘোরে' নামে বই বের হয়ে গেছে। এখন থেকে আর নাস্তিকদের কুযুক্তি টিকবে না।

অন্যজন বলছেন ঃ কুরআনের মহাসত্য কয়দিন আর চেপে রাখবে!–ইত্যাদি।

উক্ত কথাগুলো যে অত্যন্ত মজবুত ঈমানের লক্ষণ এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে কথা হলো এতটুকু যে, দাদীর মহব্বতে দাদীর জন্য কাঁদি ঠিকই, কিন্তু যে কবরের উপর উপুড় হয়ে কাঁদি সে কবরটা প্রকৃতপক্ষে দাদীর নয়, তা অন্যের। এতে দাদীর প্রতি মহব্বত প্রমাণ হয় ঠিকই, কিন্তু কাঁদার জায়গাটা পড়ে যায় অজায়গায়।

'পৃথিবী নয়, সূর্য ঘোরে' বইটা ক্রয় করে অনেকেই এবং তা পড়েও থাকেন অনেকে। কিন্তু তাতে যে যুক্তিগুলি রয়েছে তা গ্রহণযোগ্য কি না তা বিচার করার লোক এ সমাজে খুব কম। সে বইটা এবং তার পূর্বে প্রকাশিত 'বিজ্ঞানে কুরআনের দান' নামক বইটা পড়ে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে যা প্রতিক্রিয়া আমি লক্ষ্য করেছি তা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১. এ শ্রেণীর লোকের যুক্তি হচ্ছে এই যে, সূর্য ঘোরার সপক্ষে বৈজ্ঞানিক যুক্তিসহ বই বের হয়ে গেছে। ব্যস! বই বের হয়েছে এটাই যুক্তি। সে বই দু'খানা চোখেও হয়তো তারা দেখেননি।

২. কেউ কেউ আগ্রহ সহকারে তা পড়েছেন, কিন্তু বুঝতে পারেননি কিছুই।

www.pathagar.com

৩. যাদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, গতিশীলতা ও গতিজড়তা সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই তাদের নিকট কিছু কিছু যুক্তি খুবই ভালো লেগেছে।

৪. কেউ কেউ বইদু'খানা পড়ে মনে মনে লজ্জিত ও দুঃখিত হয়েছেন এটা ভেবে যে, ইসলামের সম্মান বাড়াতে গিয়ে কিভাবে তারা ইসলাম ও কুরআনকে অবৈজ্ঞানিক প্রমাণ করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন। অথচ তা তারা টেরই পাচ্ছেন না।

৫. যারা বে-ঈমান এবং ভৌগোলিক জ্ঞানের মধ্যে যাদের কোনো অস্পষ্টতা নেই তারা মনে করছে, ধর্ম আসলেই একটা অন্ধযুগের কুসংস্কার। সুতরাং তার অনুসারীরা তো কিছু উদ্ভট কথা বলবেই। তা না বললে তারা আর ধার্মিক হয় কি করে?

৬. যারা কুরআনী বিদ্যা ছাড়াই আধুনিক শিক্ষিত তাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছে যে, তাহলে কুরআন কি সত্যিই আল্লাহর বাণী? আল্লাহর বাণী হলে তাতে অবৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবিরোধী কথা থাকবে কেন?

এটাই হচ্ছে উক্ত বইদু'খানার ফলাফল। তাছাড়া 'পৃথিবী নয়, সূর্য ঘোরে' বইটা পড়লে মনে হয় না যে, এর লেখক–১. আকাশবিদ্যা, গতিশীলতা, গতিহীনতা ও গতিজড়তা সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট জ্ঞান রাখেন। ২. আর মনে হয় না যে, তিনি যা লিখেছেন তা তিনি নিজেই বোঝেন। তিনি প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের সম্পর্কে অত্যন্ত অশোভন উক্তি করেছেন। শিক্ষিত লোক যারা সে বই পড়েছেন তারা অবশ্যই তা বুঝতে পেরেছেন।

পৃথিবীর গতিশীলতা সম্পর্কে অতীতকালের ধারণা

অতি পুরাতন যুগের মনীষীদের মধ্যে কয়েকজন মনীষী পৃথিবী 'স্থির' থাকার পক্ষে যুক্তি পেশ করেছেন। তারা হচ্ছেন পিটাগোরাস, অ্যারিস্টটল, টলেমী, বরাহমিহির প্রমুখ প্রাচীন যুক্তিবিদগণ। তারা মনে করতেন–'সূর্য ঘুরেই দিন ও রাত হয়, পৃথিবী স্থির।' এ মতের সপক্ষে তারা যেসব যুক্তি দিয়েছেন সেসব যুক্তিগুলি নিম্নরূপ ঃ

১. যদি কোনো স্থান থেকে একটা ঢিল সোজা উপর দিকে ছুঁড়ে মারা হয় তবে সে ঢিল পুনরায় সেই স্থানে ফিরে আসে। পৃথিবী গতিশীল হলে ঐ ঢিল কিছুটা পশ্চিমে সরে পড়তো। তা যখন পড়ে না তখন বুঝতে হবে পৃথিবী 'স্থির'।

www.pathagar.com

২. একটা পাখি তার বাসা থেকে পশ্চিম দিকে উড়ে গেলে সে আর কোনোভাবেই তার পূর্বের বাসায় ফিরে আসতে পারতো না।

৩. পরবর্তীকালের যুক্তি, একটা হেলিকপ্টার যদি উপরে কিছুক্ষণ একই স্থানে দাঁড়িয়ে থেকে নিচে নেমে আসে তবে যেখান থেকে উঠেছিল সেখানেই নামে। পৃথিবী গতিশীল হলে ঐ হেলিকপ্টার অনেকটা পশ্চিমে সরে নামতো। তা যখন হয় না তখন বুঝতে হবে পৃথিবী 'স্থির'।

হাল জমানায় কিছু বই বেরিয়েছে তাতেও প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, 'পৃথিবী স্থির, সূর্য ঘুরেই দিনরাত হয়।'

এসব যুক্তি অনেক পূর্বেই আল-কুরআনে বিশ্বাসী মুসলিম প্রতিভা 'আল বেরুনী' কর্তৃক খণ্ডিত হয়েছে। তিনি অনেক বাস্তব প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করেছেন–'গতিহীনতা ও গতিশীলতা একই ফল উৎপাদন করে।'

তিনি (আল বেরুনী) তাঁর নিজের লেখা আসারুল বাকিয়া, আত্ তাফহীম, কানুনে মাসউদী ইত্যাদি গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন 'পৃথিবী গতিশীল'। তাঁর সেসব গ্রন্থ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অক্সফোর্ড, বার্লিন ও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আলোচিত হতো।

মানুষ যখন কোনো সত্য আবিষ্কারের জন্য চেষ্টা করে তখন প্রথমবারের চিন্তাতেই সত্য ধরা পড়ে না। কারণ মানুষের জ্ঞান পূর্ণ নয়। আল্লাহর জ্ঞানই পূর্ণ। অতঃপর চিন্তা করতে করতে যা সত্য তা মানুষের জ্ঞানে আল্লাহরই অনুগ্রহে ধরা পড়ে যায়। যেমন হযরত ইবরাহিম (আ)-এর প্রথম চিন্তায় মনে প্রশ্ন জাগলো যে, তারকাই কি রব?

পরবর্তী চিন্তায় মনে হলো, তবে কি চাঁদই রব?

এরপর চিন্তা করলেন, তাহলে সূর্যই কি রব?

অতঃপর সর্বশেষ চিন্তায় তিনি বুঝতে পারলেন, পূর্বের চিন্তাগুলি সব-ই ভুল ছিল। এই ঘটনা থেকে এটাও প্রমাণ হলো যে, কোনো মহাসত্যই কারো প্রথম চিন্তায় ধরা পড়ে না। মানুষের প্রথম যুক্তি পরবর্তী যুক্তি দ্বারা খণ্ডিত হয়ে যায়। অতঃপর এমন এক স্থানে এসে পৌঁছে, যেখানের যুক্তিগুলো একেবারে অকাট্য–যা আর কোনো যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করা যায় না।

যেমন হযরত ইবরাহিম (আ)-এর শেষ যুক্তি ছিল, যা উদয় হয় এবং অস্ত যায় সে তো কারো হুকুমের ফরমাবরদার। সুতরাং সে কিছুতেই 'রব' হতে পারে না। 'রব' তিনিই হতে পারেন, যিনি 'ফাতারাস্ সামাওয়াতি

www.pathagar.com

ওয়াল আরদ্।' অর্থাৎ 'আসমান-জমিনের যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনিই আমার রব।' এটা ছিল সর্বশেষ যুক্তি এবং এটা ছিল এমনি যুক্তি যা আর কোনো যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করা যায় না। ঠিক তেমনি পৃথিবী গতিশীল কি না এ সম্পর্কে সর্বশেষ যুক্তিই হচ্ছে অকাট্য যুক্তি যা আল-কুরআনের সপক্ষে এবং তা এমন যুক্তি যা আর খণ্ডন করা যায় না। যেমন হযরত ইবরাহিম (আ)-এর শেষ যুক্তি খণ্ডন করা যায় নাই।

এর থেকে আরো প্রমাণ হলো, মহাসত্য আবিষ্কারের জন্য মন-মগজটা হযরত ইবরাহিম (আ)-এর মতো হতে হবে নিরপেক্ষ। তিনি যদি তাঁর প্রথম যুক্তির উপর জিদ করে বসে থাকতেন, তবে তাঁর নাম নবীর তালিকায় প্রথম দিকে ও 'মুসলিম জাতির পিতা' হিসেবে কিছুতেই পাওয়া যেত না। তাঁর মন ছিল নিরপেক্ষ, তাই মহাসত্যের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। আর ইসলামের শিক্ষাই হচ্ছে মনকে নিরপেক্ষ করা। তাই হযরত ইবরাহিম (আ) যখন ভুল চিন্তা থেকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন তখন তিনি যে দোয়া পড়েছিলেন সেই দোয়া (ইন্নি ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাজি ফাতারাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানিফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন) আজও আমাদের জায়নামাযে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়।

এটা এজন্য পড়তে হয় যে, আমরাও যেন আমাদের মনটাকে তদ্রূপ নিরপেক্ষ করতে পারি।

পৃথিবীর গতিশীলতা সম্পর্কে আলেমগণের ধারণা

আল-কুরআনের উপর গবেষণার জন্য কোনো সুব্যবস্থা না থাকার কারণে আলেমদের মধ্যে কিছুসংখ্যক আছেন যারা 'কুল্লুন ফি ফালাকিইঁ ইয়াসবাহুন' থেকে সূর্য ও চন্দ্রের ঘোরা বোঝেন। তাঁরা পৃথিবীকে 'স্থির' মনে করেন। অথচ আয়াতটির অর্থ 'মহাশূন্যের মধ্যে সবকিছুই ঘুরছে বা সাঁতরাচ্ছে।'

পূর্বে এমন এক সময় ছিল যখন পৃথিবীকে মহাশূন্যের মধ্যে অবস্থিত মনে করা হতো না। মনে করা হতো পৃথিবী থেকে যা কিছু ঊর্ধ্বাকাশে দেখা যায় ঐগুলিই মহাশূন্যের মধ্যে অবস্থিত, কিন্তু পৃথিবী মহাশূন্যের মধ্যে অবস্থিত নয়। সেই সাবেক ধারণা এখনো অনেকের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু যাঁরা আধুনিককালের উচ্চ দরজার আলেম তাঁদের সেসব ধারণা কেটে গেছে। কিন্তু তাঁরা দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলার জন্য এসব বিষয়ে কিছু উচ্চবাচ্য করেন না।

www.pathagar.com

আর কিছু রয়েছেন যাদের মনের অস্পষ্টতা এখনো দূর হয়নি। তাঁরা সম্ভবতঃ আরো জোরালো যুক্তির অপেক্ষায় রয়েছেন। আর এমনও কিছু সংখ্যক আলেম রয়েছেন যাঁরা অত্যন্ত মুখলেস। তাঁরা ঈমানের মধ্যে যেন কোনো প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি না ঢুকতে পারে সেজন্য অত্যন্ত হুঁশিয়ার। তাঁরা পূর্ব ধারণার বাইরে কিছু চিন্তা-ভাবনা করতেও নারাজ। তাঁরা তাঁদের ছাত্রদেরকে এমন তা'লীম দিয়ে থাকেন যে, পাস করার জন্য খাতায় লিখতে পারো 'পৃথিবী ঘুরিয়া দিন-রাত হয়', কিন্তু খবরদার তা বিশ্বাস কোর না। তাহলে ঈমান নষ্ট হবে।

এ গ্রুপের মধ্যে এমন কিছু আলেম রয়েছেন যাঁরা সাবেক ধারণার সপক্ষে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে সাবেক মতকেই টিকিয়ে রাখতে চান। তাঁদের সেসব যুক্তি ও তার পাল্টা যুক্তি নিম্নে দেয়া হলো।

সাবেক মত ও পাল্টা যুক্তি

১৯৬৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সাপ্তাহিক 'জাহানে নও' পত্রিকায় এক 'বিতর্ক' প্রকাশিত হয়। এতে 'পৃথিবী নয়, সূর্য ঘোরে' প্রস্তাবের সপক্ষে জনাব মাওলানা আবু জাফর সিদ্দিকী ৬টি যুক্তি পেশ করেন। তাঁর প্রথম যুক্তি ছিল ঃ

"এই গোল পৃথিবীর পরিধি ২৫,০০০ মাইল। তা ২৪ ঘণ্টায় আপন আবর্তন পথে একবার আবর্তন করে। এতদ্ব্যতীত বেশি পথ অতিক্রম করা তার পক্ষে অসম্ভব। কারণ প্রত্যেক গোলাকার বস্তু তার পরিধি পরিমাণের চেয়ে বেশি পথ অতিক্রম করতে পারে না। আবার বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন যে, সূর্য পৃথিবী হতে ৯,২৭, ০০,০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে যে কক্ষপথ প্রদক্ষিণ করে তার পরিমাণ ৬০ কোটি মাইল। কিন্তু পৃথিবী বছরে মাত্র ৯১,২৫০০০ মাইল চলে তা কিভাকে ৬০ কোটি মাইল কক্ষপথ অতিক্রম করবে? এতে প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবী গতিশীল হওয়া অমূলক।"

উপরিউক্ত চিন্তাটা যে উন্নত ধরনের তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে চিন্তাটির মধ্যে যা একটা ভুল দিক রয়েছে তা তিনি নিজেই পূনঃ পুনঃ চিন্তা করলে অবশ্যই ধরতে পারতেন। আমি সে ভুলটা তুলে ধরছি। যথা ঃ

তিনি বলেছেন–'প্রত্যেক গোলাকার বস্তু তার পরিধি পরিমাণের চেয়ে বেশি পথ অতিক্রম করতে পারে না।' এ যুক্তি তখনই ঠিক যখন কোনো

www.pathagar.com

গোলাকার বস্তু কোনো কঠিন পদার্থের উপর দিয়ে ঘোরে। যেমন ধরুন, একখানা গাড়ির চাকার পরিধি যদি মাত্র ৫ ফুট হয়, তবে রাস্তার উপর দিয়ে ঐ চাকা একবার ঘুরলে ৫ ফুট পথই অতিক্রম করবে। ৫০ বার ঘুরলে ৫০×৫=২৫০ ফুট পথ অতিক্রম করবে। যদি পৃথিবী সেইরূপ কোনো রাস্তার উপর দিয়ে ঘুরতো তাহলে মাওলানা সাহেবের যুক্তি এখানে ঠিকই হতো। তিনি যে হিসাব দিয়েছেন সে হিসাবটা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর পরিধি ২৫০০০ মাইল। ২৪ ঘন্টায় একবার ঘোরে ২৫০০০ মাইল। তাহলে ৩৬৫ দিনে ঘুরবে ৩৬৫×২৫০০০=৯১,২৫০০০ মাইল। অর্থাৎ একদিনে ২৫.০০০ মাইল, ৩৬৫ দিনে ৩৬৫ বার ২৫,০০০ হাজার মাইল। এই হলো তাঁর (মাওলানা সিদ্দিকী সাহেবের) হিসাব।

এ যুক্তি অবশ্যই ঠিক হতো যদি পৃথিবী কোনো রাস্তার উপর দিয়ে ঘুরতো। কিন্তু ঘোরে শূন্যের উপর দিয়ে। তাই ঐ যুক্তি এখানে অচল। পৃথিবীর দুইটি গতি আছে। একটি গতি হচ্ছে দৈনিক গতি, আরেকটি গতি হচ্ছে বার্ষিক গতি। এটা বুঝানোর জন্য আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি ঃ

দেখুন, একটা ফুটবলকে লাথি মেরে উপরে তুলে দিলে ঐ বলটির মধ্যে দু'টি গতির সৃষ্টি হয় ঃ ১. বলটি ধনুকের জ্যা-এর মতো একটা বৃত্তচাপ আকারের পথ দ্রুত গতিতে অতিক্রম করে। ২. বলটি ছুটে চলার সময় ঘুরতে ঘুরতে যায়। ধরুন ঐ বলটিকে যেখান থেকে লাথি মেরে দূরে ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে সেখান থেকে ৫০ হাত দূরে গিয়ে বলটি মাটিতে পড়লো। বলটি শূন্য দিয়ে ছুটে যাওয়ার সময় যে ঘুরতে ঘুরতে যাচ্ছিল তাতে সে মাত্র ৪ বার ঘুরেই মাটিতে পড়ে গেল।

যদি বলটির পরিধি ১৮ ইঞ্চি হয় তবে বলটিকে মাটির উপর দিয়ে ঘুরিয়ে বা গড়িয়ে নিলে ৫০ হাত দূরে যেতে অবশ্যই ৫০ বার ঘোরা লাগতো। কিন্তু শূন্য দিয়ে ছুটে যাওয়ার সময় মাত্র ৪ বার ঘুরেই ৫০ হাত দূরে চলে গিয়েছে।

এই বলটি লাথি মেরে দূরে ছুঁড়ে দিলে তার মধ্যে যে গতি সৃষ্টি হয়, সে গতি বাধাপ্রাপ্ত হয় মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও বায়ুতে। যদি বায়ু এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাকে বাধা না দিতো, আর যদি ৫০ হাত দূরে গিয়ে মাটিতে বেঁধে না যেত, আর ঐ একই নিয়মে যদি একই গতিতে সে চলতে পারতো তাহলে তার পথ হতো দিব্যি একটা বৃত্তাকার পথ।

অতঃপর সেই পথে বলটি ঐ একই নিয়মে চলতে ও ঘুরতে পারলে সে যখন পুরো বেড়টা একবার ঘুরে আসতো তখন ঐ ৫০ হাত যদি পুরো

www.pathagar.com

বেড়টার $\frac{১}{৮}$ অংশ হয় তবে ৫০×৮=৪০০ হাত পথ অতিক্রম করলে তার বৃত্তের চার পাশ দিয়ে যখন একবার ঘোরা হয়ে যেত তখন বলটির আপন মেরুদণ্ডের উপর ঘোরা হতো মাত্র ৮×৪=৩২ বার।

যদি ৪০০ হাত রাস্তার উপর দিয়ে বলটাকে গড়িয়ে নেয়া হতো তবে বলটাকে ৪০০ হাত পথ অতিক্রম করতে ৪০০ বারই ঘুরতে হতো। কিন্তু শূন্য দিয়ে চলার কারণে মাত্র ৩২ পাক দিতে দিতে তার ৪০০ হাত পথ অতিক্রম করা হয়ে যায়। ঐ বলের জন্য এটা যেমন সম্ভব ঠিক তেমনি সূর্যের চার পাশের ৬০ কোটি মাইলের দীর্ঘ পথকে পৃথিবীর পক্ষে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় শূন্য জায়গা দিয়ে একবার অতিক্রম করা সম্ভব। এতে পৃথিবীকে মহাশূন্যের ভিতর দিয়ে প্রতি মিনিটে চলতে হয় (৬০ কোটি মাইল÷৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা×২৪×৬০=) প্রায় ১২০০ মাইল গতিবেগে।

তাহলে বার্ষিক গতির ফলে পৃথিবী ১ মিনিটে চলে প্রায় ১২০০ মাইল। আর এই পথ অতিক্রম করার সময় পৃথিবী তার নিজের মেরুদণ্ডের উপর ঘুরতে গিয়ে ঘোরে মাত্র ২৫০০০÷(২৪×৬০)= প্রায় ১৭ মাইল প্রতি ১ মিনিটে। তাহলে এই নিয়মে পৃথিবী যখন আপন মেরুদণ্ডের উপর দিয়ে ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরে আসে তখন ঐ সময়ে পৃথিবী তার বার্ষিক আবর্তনপথে ছুটে চলে ৬০ কোটি মাইল÷৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা=প্রায় ১৭,১৫,০০০ মাইল।

যদি এই পথ পৃথিবী কোনো রাস্তার উপর দিয়ে গড়িয়ে যেত তবে মাওলানা সাহেবের যুক্তি অনুযায়ী পৃথিবী চলতে পারতো ১ দিনে মাত্র ২৫,০০০ মাইল। কিন্তু শূন্য দিয়ে ছুটে চলার কারণে একদিনে যেতে পারে ১৭,১৫,০০০ মাইল। অর্থাৎ গড়িয়ে যাওয়ার তুলনায় ৬৮ গুণ বেশি পথ। এভাবে শূন্য দিয়ে দ্রুত ছুটে যাওয়ার কারণে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় পৃথিবী তার দীর্ঘ ৬০ কোটি মাইল পথ অতিক্রম করতে পারে।

অতঃপর আমি আশা করি মাওলানা সিদ্দিকী সাহেব এবার তার যুক্তির দুর্বল দিকটা ধরতে পেরেছেন। আমার উদ্দেশ্য কারো সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হওয়া নয় বরং আমি মনে করি, যে আল্লাহ যথাযথভাবে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন সে আল্লাহরই বাণী মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। তাহলে সে কুরআনের কথা নিশ্চয়ই অবৈজ্ঞানিক হতে পারে না। তাহলে সে কুরআনের যারা অনুসারী তারা যখন বলবেন, কুরআনে অমুক কথা আছে, আর অন্যে যদি

www.pathagar.com

তা বাস্তবতাবিরোধী বলে দাবি করে তবে অবশ্যই তাকে যুক্তি দিয়ে বুঝাতে হবে যে, কুরআন বাস্তবতাবিরোধী নয়।

বুঝানোর পরেও যদি কেউ না বোঝে তবে সেজন্য আমরা দায়ী হবো না। কিন্তু তাকে এমন যুক্তি দিয়ে বুঝাতে হবে যেন যুক্তিটা অখণ্ডনীয় হয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষ সে যে ধর্মেরই হোক না কেন, অখণ্ডনীয় যুক্তি হলে তা মানেই। এটাই মানুষের স্বভাব।

আল-কুরআনে রয়েছে, কুল্লুন (সবকিছুই) ফি ফালাকিন (মহাশূন্যের মধ্যে) ইয়াসবাহুন (ঘুরছে)। এ থেকে যারা পৃথিবীকে মহাশূন্যের বাইরে মনে করেন তারা অবশ্যই 'পৃথিবী স্থির' বলতে পারেন। কিন্তু বললে তা প্রমাণ করতে হবে তো? আর সে প্রমাণটা হতে হবে যুক্তিগ্রাহ্য। আর তা যুক্তিগ্রাহ্য তখন-ই হবে যখন তার সমস্ত পাল্টা প্রশ্নের সঠিক জবাব দেয়া যাবে। শুধু মাওলানা সিদ্দিকী সাহেবের মতো এতটুকু বলে ছেড়ে দিলেই সমাজ তা মানবে না যে, 'এতে প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবী গতিশীল হওয়া অমূলক।'

কিন্তু মাওলানা সাহেবের ঐ যুক্তি থেকে একটা পাল্টা প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে, তাহলে পৃথিবী কি জমিনের উপর দিয়ে গড়াচ্ছে যে, পৃথিবী ৩৬৫ দিনে ৯১,২৫,০০০ মাইল পথ চলবে?

এ প্রশ্নের জবাব কে দিবে? তিনি 'জাহানে নও' পত্রিকার মাধ্যমে যে যুক্তিগুলি পেশ করেছেন সে যুক্তিগুলি হুবহু 'বিজ্ঞানে কুরআনের দান' বইয়ের ১৪৩ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া। ঐ বইয়ে 'পৃথিবী স্থির'-এর সপক্ষে আল-কুরআন থেকে যুক্তি স্বরূপ যেসব আয়াত পেশ করা হয়েছে এবং সেইসব আয়াতের যে অর্থ করা হয়েছে আমি হুবহু সেইসব কথাগুলি এর মধ্যে তুলে ধরছি এবং তার পাশাপাশি আমার যুক্তিগুলিও পেশ করছি।

'বিজ্ঞানে কুরআনের দান' বইয়ের ১৩৭ পৃষ্ঠায় পৃথিবী স্থির হওয়ার সপক্ষে নিম্নোক্ত আয়াতগুলি পেশ করা হয়েছে ঃ

اَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ -

অর্থ ঃ এবং তিনি পৃথিবীতে পর্বতমালা সংস্থাপিত করিয়াছেন, যেন তাহা তোমাদের সাথে আলোড়িত না হয়। (সূরা লোকমান ঃ ৯)

উক্ত বইয়ে লেখা উপরিউক্ত কথা থেকে প্রশ্ন আসে, আল্লাহ কেন বললেন–'যেন তা তোমাদের সাথে আলোড়িত না হয়?'

www.pathagar.com

এর অর্থ কি তাহলে এই হবে যে, আমরা আলোড়িত হচ্ছি, কিন্তু পর্বতের কারণে পৃথিবী আলোড়িত হচ্ছে না এবং এই 'আলোড়ন' কথাটা এখানে আনাইবা হলো কেন? কুরআনপাকে কি এমন কোনো একটা কথাও আছে যার বাস্তবতা নেই অথচ তার উপর আল্লাহ কোনো কিছু বলেছেন?

আসলে আল্লাহ এ পৃথিবী কিভাবে সৃষ্টি করেছেন তা নিয়ে আমাদের বুঝার অভাব থাকতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তা ভালোই জানেন। তিনি জানেন মানুষের মনে প্রশ্ন জাগবে যে, পৃথিবী ঘোরার সময় তার উপরিভাগ স্থানচ্যুত হয় না কেন।

তার জবাবে আল্লাহ বলেছেন–'আমি পাহাড়-পর্বত দ্বারা খিল মেরে দিয়েছি যেন ঘোরার সময় কোনো স্থানই স্থানচ্যুত না হয়।'

দেখুন, যা স্থির তা এমনি অবস্থায় ফেলে রাখলেই পড়ে থাকে। তাতে কোনো পেরেক মারার দরকার হয় না। আর যা-ই ঘোরে তারই সঙ্গে খিল মারার প্রশ্ন জড়িত।

ঐ বইয়ের ১৩৮ পৃষ্ঠায় যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছে ঃ

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهَادًا وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ـ

অর্থ ঃ তবে কি আমি ভূতলকে শয্যা এবং পর্বতসমূহকে কীলক স্বরূপ সৃষ্টি করি নাই (এ অর্থও উক্ত বইয়ের)।

এখানেও যে 'কীলক' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তারও অর্থ তা-ই যে, পৃথিবী যেহেতু ঘোরে, তাই ঘোরার সময় যেন স্থাচ্যুত না হয় সেজন্য কীলক মারার কথা বলা হয়েছে। অন্যাথায় কীলকের কথা বলার প্রয়োজনটা কি ছিল?

ঐ বইয়ে ২ নম্বর যুক্তি হিসেবে আনা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতটি ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ط

অর্থ ঃ এবং উহাও তাহার নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত যে, তাহার আদেশে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। (সূরা রুম ঃ ২৫)

এখানে 'নিদর্শনাবলী' ও 'সুপ্রতিষ্ঠিত' কথাদু'টি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। 'নিদর্শনাবলী' থেকে এখানে খোদার কুদরতের নমুনা বুঝানো হয়েছে এবং

www.pathagar.com

'প্রতিষ্ঠিত' থেকে আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুকে বিজ্ঞোচিতভাবে সুবিন্যস্ত করা এবং পৃথিবীকে তার আপন কক্ষের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করার কথা বুঝানো হয়েছে।

এতে পৃথিবী 'গতিশীল নয়' এ কথা বুঝায় না বরং বুঝায় আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে এটাও একটা বিশেষ নিদর্শন যে, মহাশূন্যের সবকিছুকেই আল্লাহ 'গতিশীল অবস্থায়' সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, 'গতিশীল অবস্থায়' কথাটা আমি আবিষ্কার করলাম কোত্থেকে। এর জবাবে বলবো, 'গতিশীল' কথাটা আল-কুরআন থেকেই আবিষ্কার করেছি। আল-কুরআনে মহাশূন্যের সবকিছুর মধ্যেই দুইটি গতির কথা উল্লেখ রয়েছে। একটা গতির কথা বলা হয়েছে كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ-এর মধ্যে। এখানে পৃথিবীর দৈনিক গতির প্রতি ইংগিত রয়েছে। অন্যটির কথা বলা হয়েছে كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى -এর মধ্যে। অর্থাৎ মহাশূন্যের মধ্যে সবকিছুই একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলবে। ঐ আয়াত থেকে পৃথিবীর বার্ষিক গতি বুঝাচ্ছে। 'গতিশীল' কথাটা আমি এখান থেকেই আবিষ্কার করেছি। এ সম্পর্কিত ৫টি আয়াত প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে।

৩য় যুক্তি হিসেবে উক্ত বইয়ে উল্লেখ হয়েছে ঃ

اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا *

অর্থ ঃ তিনিইবা কে যিনি জমিনকে স্থিতি ও বসবাসের জায়গা বানাইয়াছেন, উহার বুকে নদ-নদী প্রবাহিত করিয়াছেন এবং ইহাতে (পাহাড়-পর্বতের) স্তম্ভ গাড়িয়া দিয়াছেন ও পানির দুইটি ধারার মধ্যখানে আড়াল সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন? (সূরা নামল ঃ ৬১)

এই আয়াতের মাধ্যমে পৃথিবী গতিশীল হওয়া না হওয়া কিছুই বুঝায় না। বরং এর থেকে এটাই বুঝায় যে, আল্লাহ তাঁর কুদরতে পৃথিবীতে 'মাধ্যাকর্ষণ' নামে এমন এক শক্তি সৃষ্টি করেছেন যার কারণে পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলের অধিবাসীগণই পৃথিবীতে বসবাস করতে পারে এবং তাঁরই অসীম কুদরতের সৃষ্টি মাধ্যাকর্ষণের কারণে পানিও পৃথিবীর গায়ের সঙ্গে

www.pathagar.com

এমনভাবে জড়িয়ে রয়েছে যে, কোনো এক বিশেষ দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে না। বরং মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, বায়ুপ্রবাহ ও তাপের তারতম্যের মাধ্যমে নদী ও সমুদ্রের পানির মধ্যে স্রোত প্রবাহিত হওয়ার কারণ সৃষ্টি করা হয় যার দ্বারা নদীগুলোকে আমরা স্রোতস্বিনী হিসেবে দেখতে পাই।

অতঃপর আল্লাহ যখন পর্বতমালা ও সমুদ্রের মধ্যে প্রাচীরের কথা বলেছেন তখন নিশ্চয়ই এর মধ্যে বুদ্ধিমানের জন্য এমন কিছু শিক্ষা রয়েছে যার দ্বারা পর্বত ও সমুদ্রের আড়াল বা প্রাচীর থেকে বিশেষ কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বুঝা যায়। সমুদ্রের মধ্যে যে প্রাচীর তা নিশ্চয়ই ইট দিয়ে গাঁথা কোনো প্রাচীর নয়, সে প্রাচীর হচ্ছে নোনা পানি ও মিঠা পানি এবং ঘোলা পানি ও স্বচ্ছ পানির পৃথক পৃথক অবস্থান। পর্বত ও সমুদ্রের কথা পাশাপাশি আলোচনার মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব রয়েছে তা এই বইয়ের 'বৃষ্টিপাতের কারণ' অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

উক্ত বইয়ের ৪ নম্বর যুক্তি ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ۚ إِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ ط

অর্থ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে টলিয়া যাওয়া হইতে ফিরাইয়া রাখিয়াছেন। উহা যদি টলিয়া যায়, তাহা হইলে আল্লাহর পরে দ্বিতীয় কেহ উহাকে ধরিয়া রাখিবার নাই। (সূরা ফাতাহ্ ঃ ৪১)

ইমাম তিরমিযী হযরত নবী করিম (সা)-থেকে এক হাদীস বর্ণনা করেছেন–'যে সময় আল্লাহ তায়ালা ভূতল সৃষ্টি করেছিলেন তখন তা কাঁপছিল। তারপর তিনি পর্বতমালা সৃষ্টি করে ভূতলের প্রতি হুকুম করলেন, তাতে পৃথিবী স্থির হয়ে গেল।' (মিশকাত)

এই একই মর্মে ইমাম হাকিম সহীহ সনদ সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ

عَنْ قَتَادَةَ قَوْلُهٗ إِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَ مِنْ مَكَانِهَا ـ

অর্থ ঃ হযরত কাতাদা (রা) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা আসমানসমূহ ও পৃথিবীকে নিজ নিজ স্থান হইতে সরে যেতে দেন না।

www.pathagar.com

উপরিউক্ত বাচনভঙ্গিকে অবলম্বন করে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, পৃথিবী যদি স্থিরই হবে তবে স্ব স্ব স্থানে ধরে রাখা, সরে নড়ে যেতে না দেয়া, সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় পৃথিবী কাঁপছিল, পাহাড় দ্বারা পেরেক মারা হয়েছে, স্থানচ্যুত হতে দেয়া হয় না (উক্ত বইয়ের ১৪০ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে), আল্লাহ তায়ালা আসমানসমূহকে স্ব স্ব স্থান হতে সরে গিয়ে ঊর্ধ্বগামী ও অধঃগামী হতে দেন না–এখানের এই 'ঊর্ধ্বগামী ও অধঃগামী হতে না দেয়া' এসব কথাগুলি কোন প্রয়োজনে বলা হয়েছে? এর প্রত্যেকটি কথা থেকেই প্রমাণ হয় 'পৃথিবী গতিশীল'। এটা কি করে প্রতীয়মান হয়, নিম্নে তা একে একে তুলে ধরা হলো ঃ

১. 'স্ব-স্থানে ধরে রাখা'-এর অর্থ যা স্থির তা কোনোদিনও ধরে রাখতে হয় না, বিনা ধরাতেই তা স্থির হয়ে থাকে। কিন্তু যখনই গতিশীল তখনই তা ধরে রাখার প্রশ্ন আসে। দ্রুতগামী ট্রেন চলার সময় রেলের পাটি যেমন গাড়ির চাকাকে ধরে রাখে তেমনি আল্লাহপাকও গতিশীল ও ঘূর্ণায়মান পৃথিবীকে এর কক্ষপথে ট্রেনের পাটির ন্যায় নিজ কুদরতে ধরে রেখেছেন যেন স্থানচ্যুত না হয়। দ্রুতগামী ট্রেনেরই স্থানচ্যুত হওয়ার প্রশ্ন আছে, কিন্তু যা স্থির তার স্থানচ্যুত হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

২. পৃথিবী কাঁপছিল কেন? পৃথিবীকে যখন আল্লাহ তার নির্ধারিত কক্ষপথে চালু করে দিলেন তখনই তা কেঁপে উঠেছিল। অতঃপর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও পর্বতমালা দ্বারা পৃথিবীকে তার আপন কক্ষপথে এমনভাবে মজবুত করে দিলেন যেন তা আর না কাঁপে।

দেখুন, সামান্য একখণ্ড কাগজও যদি কোনো স্থানে রেখে দেয়া হয় তবে সে কাগজটুকরাও (বাতাস না হলে) কাঁপে না বা নড়েচড়ে না। আর এতবড় বিরাট পৃথিবী কেন কেঁপে উঠলো?

উঠলো ঐ কারণে যে, আল্লাহ পৃথিবীকে এমনভাবে চালু করে দিলেন যেন একটা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে ও বিভিন্ন ঋতুর পরিবর্তনের মাধ্যমে এক একটা বছর অতিক্রান্ত হতে পারে এবং যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে যেন একটা দিন ও একটা রাত হতে পারে এবং এ দিন-রাত ও বছরপূর্তি যেন হতেই থাকে।

আমি পূর্বেই বলেছি, যেসব কল-কব্জা দ্রুত ঘোরে সেসব কল-কব্জাগুলো মজবুত নাট-বল্টু দ্বারা আটকিয়ে দেয়া হয় যেন মেশিন ঘোরার সময় কোনো পার্টসই স্থানচ্যুত না হয়। আল্লাহ পর্বতশ্রেণী দ্বারা পৃথিবীকে

www.pathagar.com

যে খিল মারার কথা বলেছেন তা এ কারণেই যে, পৃথিবীকে আল্লাহ দ্রুতগতিতে ঘুরাচ্ছেন ও চালাচ্ছেন। এভাবে চালানোর কারণে যেন পৃথিবীর কোনো অংশ স্থানচ্যুত না হয় সেজন্যই খিল মারার কথা বলা হয়েছে। না হলে খিল মারার কোনো প্রশ্নই উঠতো না।

৩. 'সরে নড়ে যেতে দেয়া হয় না ও উঁচু-নিচু হতে দেয়া হয় না'-এর অর্থ এই যে, পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে সূর্যকে কেন্দ্র করে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল ব্যাসার্ধবিশিষ্ট ৬০ কোটি মাইল পরিধির একটা গোলাকার বৃত্তের (এর ব্যাখ্যা পরে দেয়া হবে) চারপাশ দিয়ে প্রতিবছরে এক একবার ঘোরার সময় যদি সামান্য পরিমাণেও পৃথিবী তার কক্ষপথ থেকে সরে নড়ে যেত বা প্রতিবছরে যদি একচুল পরিমাণও উঁচু-নিচু হতো তবে কলের গানের রেকর্ডের পাশে লাগিয়ে দেয়া পিন যেমন ঘোরে আর রেকর্ডের কেন্দ্রের দিকে এগুতে থাকে তেমনিভাবে পৃথিবী সরে কিছুটা উপরের দিকে গেলে কবে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবী সূর্যের মধ্যে ঢুকে যেত কিংবা যদি প্রতিবছর ঘুরতে ঘুরতে কিছুটা দূরে সরে যেত, তবে বহু পূর্বেই পৃথিবী সূর্য থেকে বহু দূরে সরে যেত এবং পৃথিবী কবে বরফে ঢাকা পড়ে যেত। অর্থাৎ সূর্য থেকে দূরে সরে গেলে পৃথিবী সূর্যকিরণ থেকে বঞ্চিত হতো, ফলে তাপবিহনে পৃথিবী বরফে ঢাকা পড়ে যেত।

উক্ত কারণেই আল্লাহ বলেছেন–'পৃথিবীকে সরে নড়ে যেতে দেয়া হয় না।' এবং রাসূল (সা) বলেছেন–'উঁচু-নিচু হতে দেয়া হয় না।'

প্রকৃত পক্ষে আল্লাহপাক এ ধরনের যেসব কথা বলেছেন তা অনড় পৃথিবীর জন্য আদৌ খাপ খায় না। তা কেবলমাত্র গতিশীল পৃথিবীর জন্যই খাপ খায়।

সাবেক যুক্তি

'বিজ্ঞানে কুরআনের দান' বইয়ের ১৮২ পৃষ্ঠায় পৃথিবী স্থির হওয়ার সপক্ষে জনাব মোহাম্মদ সালামতুল্লাহ খান বি, এ (অনার্স) বি, এড, এম, এ, (ডবল)-এর একটা প্রবন্ধ দেয়া হয়েছে। তাতে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, 'ঘণ্টায় ২৬ হাজার মাইল গতিবেগবিশিষ্ট দু'টি স্পুটনিক যদি বিষুবীয় অঞ্চলের একই দ্রাঘিমা হতে একই সময়ে সমদূরবর্তী কক্ষপথে পূর্ব ও পশ্চিম দুই বিপরীত দিকে নিক্ষেপ করা যায় আর যদি সত্যিই পৃথিবীর আহ্নিক গতি হেতু বিষুবীয় অঞ্চলে ঘণ্টায় ১০৪১ মাইল বেগে আবর্তন করে, তবে নিম্নলিখিত প্রতিক্রিয়াগুলি অবশ্যম্ভাবীরূপে পরিলক্ষিত হবে।

www.pathagar.com

যথা ঃ পশ্চিমমুখী স্পুটনিকটা যে সময়ে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসবে, ঠিক সেই সময়ে পূর্বাভিমুখী তা করতে পারবে না। কারণ পৃথিবীর আহ্নিক গতির কারণে পৃথিবীর ১০৪১ মাইল আহ্নিক গতি প্রথমটার পক্ষে হবে অনুকূল এবং দ্বিতীয়টার পক্ষে হবে প্রতিকূল।

তাই পৃথিবী স্থির থাকলে যদি স্পুটনিকদ্বয়ের পক্ষে ৮৭ মিনিটে একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে আসা সম্ভব হতো তবে গতিশীল পৃথিবীর আবর্তনের জন্য পশ্চিমাভিমুখীটার আবর্তন বেগ ১০৪১ যোগ হওয়ার দরুন সে প্রায় ৭৪ মিনিটেই যাত্রাস্থানে ফিরে আসতে পারবে। পক্ষান্তরে পূর্বাভিমুখীটার জন্য পৃথিবীর আবর্তন বেগ প্রতিকূল হওয়ার দরুন তার প্রায় ৯০ মিনিট সময় লাগবে।

পাল্টা যুক্তি

জনাব খান সাহেব যদি একজন বৈমানিক হতেন তবে তিনি নিশ্চয়ই তার উপরিউক্ত যুক্তিগুলি নিজেই বুঝতে পারতেন যে, তা অচল। আমি পূর্বে যে গতিজড়তার কথা বলেছি তার মধ্যে প্রমাণ করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তা স্পুটনিক হোক কিংবা গোলা-বারুদই হোক না কেন, তার প্রত্যেকটিতেই পৃথিবীর দু'টি গতি জড়িয়ে রয়েছে। সুতরাং স্পুটনিক যেদিক দিয়েই যাক না কেন, পৃথিবীর গতি যেহেতু তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তাই দুইদিকেই যেতে তার সমান সময় লাগবে।

এখানে বৈমানিকের কথা এই কারণে বলেছি যে, যদি জমিনের কোনো একটা লক্ষ্যবস্তুকে লক্ষ্য করে দু'টি প্লেনের ১টি পশ্চিম থেকে পূর্বদিক এবং অন্যটি পূর্ব থেকে পশ্চিমদিকে উড়ে যাওয়ার সময় একই বিন্দু সোজা এসে বোমা নিক্ষেপ করে, তবে কোনোটাই লক্ষ্যস্থলে পড়বে না। পূর্বগামী প্লেন থেকে নিক্ষিপ্ত বোমা পূর্বদিকে সরে পড়বে ও পশ্চিমগামী প্লেন থেকে নিক্ষিপ্ত বোমা পশ্চিমদিকে সরে পড়বে। কারণ প্লেনের গতিটা ঐ বোমার সঙ্গে জড়িয়ে যায়, ফলে বোমা নিচের দিকে পড়ার সময় গতিজড়তার কারণে সোজা নিচে পড়তে পারে না। পড়ে প্লেনের গতিতে পূর্বদিকে সরে। এই একই কারণে স্পুটনিকদ্বয়ের আবর্তনে সময়ের কোনো কম-বেশি হয় না।

ঐ বইয়ের ১৮৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলে দ্রুত ছুটে যাওয়ার সময় যদি চাঁদ সামনে পড়ে যায়, তবে তো পৃথিবীর সঙ্গে

www.pathagar.com

চাঁদের ধাক্কা লেগে যাওয়ার কথা কিংবা পৃথিবীর সঙ্গে চাঁদের যে দূরুত্ব রয়েছে তা তো আদৌ ঠিক থাকার কথা নয়। কারণ পৃথিবী তার গতিপথে ছুটে যাওয়ার সময় চাঁদকে বহু দূরে ফেলে রেখে কত দূর-দূরান্তে চলে যাবে যেখান থেকে চাঁদকে একটা জোনাকীর মতোও দেখতে পাওয়ার কথা নয়।

কিন্তু তা হয় না কেন? এর জবাব তো আল্লাহ-ই দিয়েছেন। মানুষ এসব চিন্তা করবে বলেই আল্লাহ বলেছেন ঃ

لَاالشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ط وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ـ

অর্থ ঃ চাঁদ সূর্যের নাগাল পাবে না, সূর্যও চাঁদের নাগাল পাবে না। তেমনি দিন রাতকে ধরতে পারবে না। পক্ষান্তরে মহাশূন্যের মধ্যে সবকিছুই ঘুরছে বা সাঁতরাচ্ছে–এ সবই খোদার নির্ধারিত ব্যবস্থা

(সূরা ইয়াসীন ঃ ৪০)

পৃথিবী থেকে চাঁদের সৃষ্টি হলেই পৃথিবীর গতি চাঁদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে পারে, অন্যথায় নয়। এ কারণেই আমরা দেখি যেন পৃথিবীর গতি দিয়ে চাঁদ বাঁধা রয়েছে, যে কারণ্যে চাঁদ তার আওতা থেকে বেরিয়ে যেতে পারে না। তাই চাঁদকে বলা হয় পৃথিবীর উপগ্রহ।

এই কথাকেই আল্লাহ অন্য ভাষায় বলেছেন ঃ

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

অর্থ ঃ চাঁদকে একটা নির্দিষ্ট হিসাবের মধ্যে রাখা হয়েছে যেন তাদের থেকে বিশ্ব ও মানুষ নির্দিষ্ট ফায়দা পেতে পারে।

তবে হ্যাঁ, উক্ত বইয়ের ১৪২ পৃষ্ঠায় দেয়া নিম্নোক্ত আয়াতটি পৃথিবীর স্থির হওয়ার পক্ষে বরং কিছুটা অনুকূল যুক্তি। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

قَالَ اِبْرَاهِيْمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ ـ

অর্থ ঃ ইবরাহিম বলিলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সূর্যকে পূর্বদিক হইতে আনয়ন করেন। তুমি উহা পশ্চিমদিক হইতে আনয়ন করো। ইহাতে কাফের নির্বাক হইয়া গেল।

www.pathagar.com

এখানকার এই কথাগুলির মাধ্যমে আল্লাহ কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পেশ করেন নাই। এ কথাগুলি হচ্ছে নমরুদের সঙ্গে হযরত ইবরাহিম (আ)-এর তর্কের কথা। নমরুদকে হযরত ইবরাহিম (আ) বললেন, আমার আল্লাহ তো সূর্যকে পূর্বদিক থেকে উঠিয়ে থাকেন এবং পশ্চিমদিকে ডুবিয়ে থাকেন, তুমি কি এই সূর্যকে পশ্চিমদিক থেকে উঠাতে পারবে?

এখানে এমনটি বলার অর্থ হলো তর্কের মূল বিষয়বস্তুটা যেন পৃথিবীর প্রতিটি লোকেই বুঝতে পারে । তাছাড়া সূর্য ওঠা ও ডোবা বললে 'পৃথিবী স্থির' তা বুঝায় না, বুঝায় না এজন্য যে, যারা পৃথিবী ঘোরার পক্ষে হাজারও যুক্তি পেশ করে এবং কখনোই পৃথিবীকে স্থির বলে মানে না তারাও 'সূর্য ওঠা ও ডোবা' বলে। 'সূর্য ওঠা ও ডোবা' বললেই পৃথিবীর গতি বন্ধ হয়ে যায় না। মানুষের চর্মচক্ষে যা দেখা যায় মানুষ তা-ই বলে। এতে খোদায়ী কোনো কুদরতের রূপ পাল্টে যায় না। যেমন আল-কুরআনের সূরা শামসের মধ্যে আল্লাহ বলেছেন তাঁর নিজের কথায় (এটা অন্যের কোনো তর্কের কথা নয়) ঃ ـ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا অর্থাৎ 'শপথ সেই রাতের যখন সে সূর্যকে ঢেকে ফেলে।' (এখানে তাফসীরে هَا থেকে সূর্যকে বুঝানো হয়েছে) তাহলে বলুন, রাত কি প্রকৃতই সূর্যকে ঢেকে ফেলে? যেমন আমরা পর্দা দিয়ে কিছু ঢেকে ফেলি, সূর্যকে কি তেমন রাত দিয়ে ঢেকে ফেলা যায়? তা অবশ্যই যায় না।

তবে কেন বলা হলো রাত সূর্যকে ঢেকে ফেলে? এ কথাটাও যে কারণে বলা হয়েছে সেই একই কারণে সূর্য পূর্বদিক থেকে ওঠার কথা বলা হয়েছে। এখানে যেমন সূর্যকে ঢাকার অর্থ সূর্য আড়াল হওয়া, তেমনি ওখানেও সূর্য ওঠা মানে সূর্যকে উঠতে দেখা।

আল-কুরআনে এমন বহু আয়াত রয়েছে যার উপর গবেষণা করলে তার থেকে বহু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উদঘাটিত হতে পারে। তা গবেষণা না করে তার থেকে একটা কিছু ধরে নিয়ে বাস্তবের সঙ্গে জিহাদে লিপ্ত হলে তাতে ইসলামের কোনো উন্নতি হয় না বরং সেই ব্যক্তিকেই হাস্যস্পদে পরিণত হতে হয়।

মনে রাখতে হবে, বিজ্ঞানের খোদ সৃষ্টিকর্তা যে আল্লাহ সে আল্লাহ যেমন বিজ্ঞানময় তেমনি তার কথাগুলিও বিজ্ঞোচিত। আর তা বুঝতে হলেও অত্যন্ত বিজ্ঞোচিতভাবে বুঝতে হবে। আল-কুরআনের বিজ্ঞান

www.pathagar.com

বিষয়ক আয়াতগুলির ভাসাভাসা অর্থে আসল বুঝ উদ্ধার হয় না। বিজ্ঞান বিষয়ক আয়াতগুলির অর্থ উদ্ধার করতে হলে বিজ্ঞানের উপর কিছু গবেষণা থাকা দরকার। আমি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি, আল্লাহপাক পৃথিবী ঘোরার পক্ষে যেসব আয়াত নাযিল করেছেন সেইসব আয়াত দ্বারাই পৃথিবীকে 'স্থির' প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়।

আফসোস যে, যিনি জ্ঞানচর্চার জন্য আল-কুরআনে বারংবার নির্দেশ দিয়েছেন, আর যে কুরআনই হচ্ছে সকল ধরনের বিজ্ঞানের মূল উৎস সেই কুরআনেরই যারা উত্তরাধিকারী তারাই আজ বিজ্ঞান থেকে মাহরুম। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বিজ্ঞানের যেসব শাখাগুলি সত্যিই কুরআন বিরোধী, আমাদের হাজারও যুক্তি সহকারে তা খণ্ডন করা উচিত। এজন্যে আমি আমার অতি সামান্য জ্ঞানপুঁজি নিয়ে তা খণ্ডন করার চেষ্টা করেছি 'যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব' নামক বইয়ে।

তাই বলে আমার এ মানসিকতা নেই যে, বিজ্ঞান ২/১টা বিষয়ে ভুল বললে তার সত্যটাকেও ভুল প্রমাণের চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগে যাবো।

আল্লাহ যদি সত্যিই বলতেন 'পৃথিবী স্থির' তাহলে অবশ্যই বলতেন كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ এবং বলতেন كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ اِلَّا الْاَرْضَ - مُسَمًّى اِلَّا الْاَرْضَ - অর্থাৎ 'পৃথিবী ছাড়া অন্য সবকিছুই তার কক্ষপথে চলে।' এভাবে اِلَّا الْاَرْضَ শব্দ দিয়ে পৃথিবীকে ঘোরা থেকে আল্লাহ বাদ দিতে পারতেন। কিন্তু তা বাদ দেয়া হয়নি। অথচ আল-কুরআনে এইভাবে ৷৷ দিয়ে বহু কিছুকেই একটা থেকে অন্যটাকে পৃথক করে বুঝানো হয়েছে। যেমন–

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ـ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا ـ لَااِلٰهَ اِلَّا هُوَ ـ

এই ধরনের বহু আয়াতের মতো উপরিউক্ত দু'টি আয়াতেও اِلَّا الْاَرْضَ অর্থাৎ 'পৃথিবী ছাড়া সবকিছুই ঘোরে'–একথা আল্লাহ বলতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ তা বলেননি। সুতরাং গবেষণাযোগ্য আয়াত ও হাদীসগুলির উপর উত্তমরূপে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা ছাড়াই একটা কিছু মত প্রকাশ করে বাস্তবের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া ঠিক নয়। আর এ গবেষণায় ঈমান নষ্ট হওয়ারও কোনো ভয় নেই।

www.pathagar.com

আল-কুরআনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গ

এমন নয় যে, যেসব মুফাসসির তাফসীর লিখেছেন তাঁরা সবাই প্রত্যেকটি আয়াতের একই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এমনকি সূরা ফালাক ও সূরা নাস কুরআনপাকের সূরা হওয়া সত্ত্বেও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) যিনি একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী ছিলেন, তিনি ঐ দু'টি সূরাকে কুরআনের অংশ হিসেবে স্বীকার করেন নাই। এর প্রমাণ ইবনে আব্বাস, ইমাম আহমদ, বায্যার, তাবরানী, ইবনে মারদুইয়া, আবু ইয়ালা, আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ, ইবনে হাম্বল, নঈম, আবু নুয়াইম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ প্রত্যেকেই সহীহ সনদ সূত্রে এ কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

এখানে লক্ষণীয় যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর 'মত' অন্য কেউ গ্রহণ করেননি ঠিকই, কিন্তু এ ফতোয়াও কেউ দেন নাই যে, তিনি 'বে-ঈমান' হয়ে গেছেন। তাহলে এ ঘটনা থেকে আমরা নির্ঘাত বলতে পারি, কুরআনপাকের যেসব আয়াত প্রকৃতিবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং যেসব আয়াত গবেষণার অপেক্ষা রাখে তা গবেষণা করলে ঈমান নষ্ট হওয়ার কোনো ভয় নেই। যেমন ঈমান নষ্ট হয় নাই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর।

'কুললুন ফি ফালাকিইঁ ইয়াসবাহুন' থেকে পৃথিবী ঘোরার কথাও বুঝানো হয়েছে-এর সপক্ষে আমার যুক্তি

চিন্তা করুন, পৃথিবী ঘুরে দিন ও রাত হলে পৃথিবীর উপরিভাগকে চলতে হবে প্রতি মিনিটে ২৫ হাজার মাইল÷(২৪ ঘণ্টা×৬০ মিনিট)= প্রায় ১৭ মাইল বেগে। আর যদি পৃথিবী স্থির থেকে দিন-রাত হওয়ার জন্য সূর্যকে ঘুরতে হয় তবে সূর্যের চলার গতি হতে হবে প্রতি মিনিটে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল– পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ×২×২২-২ (৩৬৫×২৪×৬০)= প্রায় ১২০০ মাইল। এখন চিন্তা করুন পৃথিবীকে যারা প্রতিমিনিটে মাত্র ১৭ মাইল বেগে ঘুরতে দিতে নারাজ তারা সূর্যকে প্রতি মিনিটে ১২০০ মাইল পথ চলতে দিতে রাজি থাকতে পারবেন কি?

www.pathagar.com

শুধু এতটুকু রাজি থাকলেও চলছে না। কারণ পৃথিবী স্থির থেকে যদি সূর্য ঘুরে দিন-রাত হয় তবে সূর্যকে যেমন ঘুরতে দেখি তেমনি আকাশের সকল নক্ষত্রকেও ঘুরতে দেখি। তাহলে ২৪ ঘণ্টায় শুধু সূর্য ঘুরলেই চলবে না, ঘুরতে হবে আকাশের সকল নক্ষত্রকেও। আর তাদেরকে ঘুরতে হবে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে এবং তাদের ব্যাসার্ধকে ঠিক রেখেই। কারণ সকল নক্ষত্রও ২৪ ঘণ্টায় একবার ওঠে ও একবার ডোবে। তাহলে প্রত্যেকটি নক্ষত্রের গতি এমন হতে হবে যেন নক্ষত্র যেটা যতদূরেই থাকুক না কেন, সে যেন ২৪ ঘণ্টায় ১ বার ঘুরে আসতে পারে। এতে আকাশের প্রত্যেকটি নক্ষত্রের ভিন্ন ভিন্ন গতি হতে হবে। কারণ পৃথিবী থেকে কোনো নক্ষত্রই সমদূরত্বে নেই। প্রত্যেকটির মধ্যেই দূরত্বের বিরাট তারতম্য রয়েছে।

চিন্তা করুন, পৃথিবী থেকে বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত বিভিন্ন তারকা মিলে যেখানে একটা 'ব'-এর আকার ধরে আছে, আবার যারা চিরকালই ঐ 'ব' আকৃতিতেই রয়েছে, আবার যারা মিলে জিজ্ঞাসার চিহ্ন অথবা আদম সুরত হয়ে রয়েছে তাদেরকে আমরা চিরকালই ঐ একই সুরতে দেখি। যদি নক্ষত্রগুলির একই গতি হতো তবে আজকের 'ব' আগামীকাল কিছুতেই 'ব'-এর আকৃতিতে থাকতে পারতো না। আজ যাকে আদম সুরতের আকারে দেখছি কাল তাকে কিছুতেই সে আকারে দেখতে পেতাম না। কিন্তু তার ব্যতিক্রম যখন দেখি না এবং প্রত্যেকটি তারকাকেই যখন তাদের পরস্পরের দূরত্ব ঠিক রেখে ঘুরতে দেখি, তখন ঐগুলি ঘুরলে প্রত্যেকটি তারকাকে মহাশূন্যের ভিতরকার এই ছোট্ট পৃথিবীর সঙ্গে এমনভাবে বেঁধে দেয়া দরকার যেমন ধান মলার সময় ৫/৬টা গরুকে একসঙ্গে একটা গাঁট খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দেয়া হয়। গরুগুলি যেমন গাঁটির একেবারে সঙ্গে যে গরুটা থাকে কয়েক পা হাঁটলেই তার একবার ঘোরা হয়ে যায়, কিন্তু সর্বশেষ গুরুটাকে ঐ একই সময়ের মধ্যে ঘুরে আসতে খুব বেগের সঙ্গে চলা লাগে। ঠিক তেমনি যে নক্ষত্র পৃথিবীর নিকটে আছে ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরে আসতে অল্প পথ অতিক্রম করতে হবে, এরপর যে যত দূরে থাকবে তাকে সেই পরিমাণ গতি বৃদ্ধি করতে হবে যেন সবাই একই সময়ের মধ্যে পৃথিবীর চারপাশ দিয়ে একবার ঘুরে আসতে পারে।

এতে বিভিন্ন পরিমাণের দূরত্বের বিভিন্ন নক্ষত্রের প্রত্যেকটির গতি হতে হবে বিভিন্ন ধরনের। হ্যাঁ, তাইবলে ১টা দড়ির সঙ্গে সবাইকে বাঁধা যাবে না। কারণ আমরা চাঁদ, সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্রগুলিকে একই সময়ের মধ্যে

www.pathagar.com

ঘুরতে দেখি না। দেখি সূর্য ঠিক ২৪ ঘণ্টায় একবার পৃথিবীর চারপাশ দিয়ে ঘুরে আসে। চাঁদকে দেখি ২৪ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ডে একবার ঘুরতে। প্রতিটি গ্রহকে দেখি বিভিন্ন গতিতে পৃথিবীর চারপাশ দিয়ে ঘুরতে। আর সকল নক্ষত্রকেই দেখি ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিটে একবার ঘুরে আসে অর্থাৎ সূর্যের চেয়ে ৪ মিনিট পূর্বে নক্ষত্রগুলির একবার ঘুরে আসা হয়ে যায়। তাহলে বুঝা গেল পৃথিবীকে গাঁট খুঁটি করে আকাশের সবকিছুকে ধান মলনে গরু জোড়ার মতো জুড়তে হবে বটে, তবে একরশিতে বাঁধলে চলবে না। গাঁট খুঁটির সঙ্গে সকল নক্ষত্রকে বাঁধতে হবে একগাছা রশি দিয়ে (কারণ তাদের মধ্যকার দূরত্ব কোনোদিনই কম-বেশি হতে দেখি না)। আর সূর্যের জন্যও একটা পৃথক রশি থাকতে হবে, চাঁদের জন্যও একটা পৃথক রশি প্রয়োজন হবে, আর দরকার হবে প্রতিটি গ্রহের জন্য একগাছা করে পৃথক পৃথক রশি। কারণ ওগুলির দূরত্ব প্রত্যহই কিছু কিছু কম-বেশি হয়। এভাবে ঘুরলে যে নক্ষত্রের আলো এখনো দুনিয়া পর্যন্ত এসে পৌঁছে নাই তাকেও ঘুরে আসতে হবে ঐ ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিটের মধ্যেই। এতে তাদের গতি যে প্রতি সেকেন্ডে কত কোটি কোটি মাইল হতে হবে তা কল্পনারও বাইরে। অথচ এটা প্রমাণিত সত্য যে, আলোর গতির চেয়ে বেশি গতি আর কিছুর-ই হতে পারে না।

কেউ ভেবে দেখেছেন কি, যে তারকার দূরত্ব পৃথিবী থেকে ১৮শত কোটি আলোকবর্ষ দূরে সে তার বৃত্তে ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরে আসতে হলে তার গতি প্রতিসেকেন্ডে কত মাইল হওয়া দরকার? তবে তারচেয়েও বেশি গতি আল্লাহ সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু তা করেছেন বলে প্রমাণ আছে কি?

যদি তার প্রমাণ থাকে তবে একটি মাত্র কারণ নক্ষত্রগুলিকে একই সঙ্গে দূরত্বের কম-বেশি না করে তা করতে পারায় যুক্তি দেয়া যেতে পারে, তাহলো আকাশের গায়ে নক্ষত্রগুলিকে আটকে দিতে হবে। এতে সব নক্ষত্র পৃথিবী থেকে একই দূরত্বে পড়বে আর প্রতি ২৪ ঘণ্টায় চলতে হবে গোটা আকাশটাকেই কোটি কোটি আলোকবর্ষের পথ অতিক্রম করে। এই একটি মাত্র যুক্তিতে পৃথিবীকে স্থির বলা চলে। কিন্তু তাতেও ফ্যাকড়া বাঁধে এখানে যে, সুর্য ও নক্ষত্রের মধ্যে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ৪ মিনিটের ব্যবধান হয়, সূর্য ও চাঁদের মধ্যে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ডের ব্যবধান হয় আর গ্রহগুলির ব্যবধানও প্রতিটির সঙ্গে ভিন্নরূপ। তাহলে 'শক্ত আকাশের গায়ে চাঁদ-সূর্য ও গ্রহ নক্ষত্র আটকে দেয়া রয়েছে'—এটাও প্রমাণিত হয় না।

www.pathagar.com

তাছাড়া আরো প্রশ্ন রয়েছে। যদি ঊর্ধ্বাকাশের সবকিছুই আকাশের সঙ্গে আটকে দেয়া হতো তবে উত্তর আয়নে ও দক্ষিণ আয়নে সূর্যকে যখন উত্তরে ও দক্ষিণে সরতে দেখি তখন তা আকাশের গায়ে আটকা থাকলে সরবে কি করে এবং কে সরাবে?

যদি বলা হয় যে, সমস্ত আকাশটাই উত্তরে ও দক্ষিণে সরে যায়, তাহলে আবার নতুন প্রশ্ন জাগবে যে, তাহলে ধ্রুব নক্ষত্র কেন উত্তর আয়নে দিগন্তরেখায় নেমে যায় না এবং দক্ষিণ আয়নের উপরে উঠে আসে না?

এসব প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়েই একশ্রেণীর লোক বলবেন– 'আল্লাহর নিকট সবই সম্ভব। তিনি কোনো যুক্তি ছাড়াই সূর্য ঘুরিয়ে দিন-রাত করতে পারেন।'

আমি বলবো, আল্লাহ তারচেয়েও বেশি কিছু করতে পারেন, এটা আল্লাহর জন্য অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু আল্লাহ এতকিছু করতে পারেন বলে যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখেন তারা কি শুধু এই বিশ্বাসই করবেন যে, আল্লাহপাক সবই পারেন, কিন্তু পারেন না শুধু পৃথিবীটাকে এমনভাবে ঘোরাতে যা আমরা টের পাবো না। নাউযুবিল্লাহ!

আল্লাহ যখন স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, মহাশূন্যের মধ্যে সবকিছুই গতিশীল (সূরা ইয়াসিন), তখন তা নিয়ে পূর্বে বলে ফেলা কথার উপর জিদ ধরে থাকার মধ্যে ইসলামের কোনো উন্নতি আছে কি?

আমার ওসব যুক্তি বাদ দিয়ে সর্বশেষ প্রশ্ন হলো এই যে, যারা পৃথিবী ছেড়ে চাঁদের উপরে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন যে, পৃথিবী আস্তে আস্তে ঘুরে একবার তার স্থলভাগের সবুজ দিকটা তাদের সামনে আসছে, আবার সেদিকটা ঘুরে আড়াল হয়ে যাচ্ছে ও সামনে এসে পড়ছে পানির উজ্জ্বল চকচকে পাশটা। তাদের নিকট 'কুললুন ফি ফালাকিইঁ ইয়াসবাহুন'-এর অর্থ কী করবেন? সেখান থেকে চাঁদকে মহাশূন্যে মনে হয় না, মনে হয় যেন পৃথিবীটাই মহাশূন্যের মধ্যে রয়েছে, যেমন রয়েছে সূর্যটা।

এখন বলুন, একজন লোক যদি চোখে দেখে যে, একটা ছেলে দৌড়াচ্ছে আর আপনি যদি বলেন–'তুমি বিশ্বাস করো সে দৌড়াচ্ছে না বরং দাঁড়িয়ে রয়েছে, এর বিপরীত বিশ্বাস করলে তোমার ঈমান যাবে'–তবে তার ঈমান সে কি করে রক্ষা করতে পারবে? যা আল-কুরআনে আছে, জ্ঞানে বলছে, পৃথিবীর বাইরে দাঁড়িয়ে চোখেও দেখা যাচ্ছে, তারপরও কি পৃথিবী 'স্থির' বলে মানতে হবে?

www.pathagar.com

আমরা চোখে যা দেখি তা-ই ঠিক নয়। যেমন পৃথিবী থেকে আমরা দেখি, প্রতি ২৪ ঘণ্টায় সূর্য ১ বার পৃথিবীর চারপাশ দিয়ে ঘুরে আসে। তারকাগুলিকে দেখি ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিটে ১ বার ঘুরতে। চাঁদে গিয়ে দেখলে দেখা যাবে ২৪ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ডে পৃথিবী ১ বার তার মেরুদণ্ডের উপর ঘুরছে। আর এই সূর্যকে সেখান থেকে দেখা যাবে ৭১০ ঘণ্টায় একবার চাঁদের চারপাশ দিয়ে ঘুরে আসতে। অর্থাৎ ৭১০ ঘণ্টায় চাঁদের একটা দিন ও রাত হচ্ছে। যে সূর্যকে আমরা ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরতে দেখি সেই সূর্যকেই যদি বৃহস্পতি গ্রহ থেকে দেখতে পারতাম তাহলে দেখা যেত ঐ সূর্যই মাত্র ১০ ঘণ্টায় একবার ঘুরে আসছে। অর্থাৎ বৃহস্পতি গ্রহে ৫ ঘণ্টা রাত থাকে।

আমরা পৃথিবী থেকে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা দেখি, কিন্তু চাঁদে গেলে তা বুঝা যাবে না। পূর্ণিমার রাতদুপুরে আমরা চাঁদকে দেখি ঠিক মাথার উপরে, আর ঐ সময় যদি কেউ চাঁদের ঠিক মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ায়, তবে সে পৃথিবীকে দেখবে তার সোজা মাথার উপরে। আর আপনি যদি তাকে এই পৃথিবী থেকে দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখেন, তবে দেখতে পাবেন চাঁদের মাঝখানে পা-টা চাঁদের সঙ্গে ঠেকিয়ে মাথাটা নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে বাদুড়ঝোলার মতো সে ঝুলছে।

এ তো পৃথিবীর বাইরের কথা। এবার শুনুন, এই পৃথিবী থেকে কেন চাঁদ-সূর্যকে ভিন্ন ভিন্নভাবে চলতে দেখা যায়।

উত্তর মেরু বিন্দুর উপর দাঁড়ালে চৈত্র মাস থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত সূর্যকে দেখা যাবে মাথার চারপাশ দিয়ে ঘুরছে। ঘুরছে বাম দিক থেকে ডান দিকে। আর দক্ষিণ মেরু বিন্দু থেকে এই সূর্যকেই আশ্বিন মাস থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত দেখবেন ডানদিকে থেকে বামদিকে ৬ মাস ধরে ঘুরছে। দুই মেরু থেকে সূর্যকে বছরে একবারই মাত্র উঠতে দেখা যায় এবং একবারই মাত্র ডুবতে দেখা যায়। আবার এই সূর্যকেই জুন মাসে লন্ডন থেকে দিনে একটানা ১৬ ঘণ্টা দেখা যায়, বাংলাদেশ থেকে দেখা যায় প্রায় ১৪ ঘণ্টা, লেনিনগ্রাদ (রাশিয়া) থেকে দেখা যায় ১৭ ঘণ্টা, নিউজিল্যান্ড থেকে দেখা যায় ১৮ ঘণ্টা, গ্রীনল্যান্ড ও হেমারফেস্ট থেকে দেখা যায় সাড়ে ২২ ঘণ্টা।

আবার চিন্তা করুন, আপনি যখন সকালবেলা জানালা দিয়ে সূর্যটা উঠতে দেখেন তখন দেখেন শান্তশিষ্টভাবে সূর্যটা উঠছে। ঐ সূর্যকেই একজন দেখছে আখাউড়া থেকে চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে ট্রেনের জানালা

www.pathagar.com

দিয়ে। সে দেখছে, যেন সূর্যটা গাড়ির সঙ্গে দ্রুতবেগে দক্ষিণ দিকে ছুটে চলছে। আর যে গাড়িটা চট্টগ্রাম থেকে ঢাকার দিকে আসছে সে গাড়ির জানালা দিয়ে ঐ সূর্যকেই দেখা যাবে ট্রেনের গতিবেগে উত্তর দিকে ছুটতে।

এখন বলুন যে, যা চোখে দেখি তা-ই কি ঠিক? তা-ই যদি হয় তবে কি করে একই সূর্য পৃথিবীর চারপাশ দিয়ে ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘোরে? আর সেই সূর্যই বৃহস্পতি গ্রহের চার পাশ দিয়ে ১০ ঘণ্টায় একবার ঘোরে? আর সেই সূর্যইবা চাঁদের চারপাশ দিয়ে ৭১০ ঘণ্টায় একবার ঘুরে আসতে পারে কি করে? আর সেই সূর্যকেই কারো জানালা দিয়ে দেখালো দক্ষিণ দিকে ছুটছে। একই সূর্যের পক্ষে এত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন গতিতে চলা কি করে সম্ভব? এসব চিন্তা-ভাবনা ও বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সর্বপ্রথম কোপার্নিকাসের জ্ঞানে ধরা পড়ে যে, পৃথিবী গতিশীল। এরপর গ্যালিলিও তা প্রমাণ করেন।

আমার উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তরে যদি কেউ বলতে চান যে, আল্লাহর নিকট কিছুই অসম্ভব নয়। তাহলে আমি বলবো, আল্লাহর নিকট যখন সব-ই সম্ভব তখন এটাও আল্লাহর জন্য সম্ভব যে, তিনি এই সূর্যকে দিয়েই পৃথিবীর উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুসহ প্রত্যেকটি এলাকায় একই সঙ্গে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১২ ঘণ্টা দিন ও ১২ ঘণ্টা রাত বানাতে পারতেন। এটা আল্লাহর জন্য লাখোবার সম্ভব। কিন্তু তা হয় না কেন?

বাংলাদেশে ও আমেরিকায় তো আল্লাহপাক একই সময় দিন ও রাত দিতে পারতেন, কিন্তু দেন না কেন? এটাকে কি আপনি আল্লাহপাকের অযোগ্যতা বলবেন (নাউযুবিল্লাহ!) নাকি আল্লাহর অলঙ্ঘনীয় বিধান বলবেন?

যারা 'কুললুন ফি ফালাকিইঁ ইয়াসবাহুল'-এর 'কুল্লুন' অর্থে শুধু 'চাঁদ-সূর্য' বলতে চান তাদেরকে আমি প্রশ্ন করবো, আকাশের তারাগুলিকেও আমরা চলতে দেখি, তাহলে 'কুল্লুন' থেকে ওগুলি বাদ দিলেও যে ওগুলি ঘোরো। তাহলে তা কি 'কুললুন'-এর মধ্যে সামিল করা যাবে? তা যদি যায় তবে 'কুল্লুন'-এর মধ্যে পৃথিবীটাকে সামিল করতে দোষটা কোথায়?

আফসোস যে, যে পবিত্র কুরআন জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভরা সেই পবিত্র কুরআনের বিজ্ঞান বিষয়ক আয়াতগুলির কোনো কোনো আয়াতকে অস্পষ্টভাবে বুঝেই আমরা এমন একটা রায় পেশ করি যা প্রকৃতপক্ষে কুরআনবিরোধী রায়-ই হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত।

www.pathagar.com

আমি আল-কুরআনের সপক্ষে আরো কিছু প্রত্যক্ষ যুক্তি হাজির করছি। যথা ঃ ১. (আমি পূর্বেও বলেছি) যদি পৃথিবী স্থির থেকে সূর্য ঘুরেই দিন-রাত হতো তবে সূর্যকে একা ঘুরলে চলে না, ঘুরতে হয় আকাশের সকল তারকাকেও।

কিন্তু খুব লক্ষ্য করে কি দেখেছেন যে, দক্ষিণ আকাশের একেবারে নিচের তারকাগুলি পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে সরে যায়, যেমন যায় মাথার উপরের তারকাগুলি পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে, কিন্তু উত্তর আকাশের ধ্রুবতারা আদৌ কেন নড়ে-চড়ে না এবং ধ্রুবতারার নিচের তারকাগুলি কেন পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে যায়? সম্ভবতঃ তা অনেকেই লক্ষ্য করে দেখেননি। দেখবেন একটু খেয়াল করে।

চন্দ্র-সূর্য যেমনিভাবে চলতে দেখি, যদি গ্রহ-নক্ষত্র তেমনিভাবেই চলতো তবে ধ্রুবতারাও পশ্চিমে সরে যেত। যেমন দক্ষিণ আকাশের তারকাগুলি সরে যায় পশ্চিমে।

মানুষ যখন ট্রেনে চলতে চলতে জানালা দিয়ে বাইরের গাছ-পালা দেখে তখন মনে হয় যেন সেগুলি ভীষণবেগে পিছন দিকে ছুটে চলছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গাছপালা পিছন দিকে ছোটে না, ছোটে ট্রেনের সঙ্গে সে নিজেই। সে যে ছুটছে তা সে বুঝতে পারবে না যদি নজরকে ভিতরেই আটকে রাখে। ঠিক তেমনি গতিশীল পৃথিবীর উপর বাস করে এর গতিকে বুঝতে পারা যায় না।

পৃথিবী ঘোরার কারণে এর উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর সোজা ঠিক উপরে যে তারকা থাকে তা নড়তে দেখা যায় না। আমরা যেহেতু বিষুবরেখা হতে প্রায় সাড়ে ২৩ ডিগ্রী উপরে আছি তাই এখান থেকে ধ্রুবতারাকেও প্রায় সাড়ে ২৩ ডিগ্রী উপরে দেখা যায়। আর যেহেতু আমরা উত্তর গোলার্ধের লোক, তাই দক্ষিণ মেরুর সোজা উপরের তারকা আমরা দেখতে পাই না। তা দেখা যায় অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে। আর ওরা যেহেতু দক্ষিণ গোলার্ধের লোক, তাই ওরা উত্তরের ধ্রুবতারা দেখতে পায় না।

কোনো চলন্ত গাড়িতে বসে যেমন যা চলে না তাই চলতে দেখা যায় ঠিক তেমনি এই গতিশীল ঘূর্ণায়মান পৃথিবীতে বসে আকাশের যা চলে না তার সবকিছুকে চলতে দেখি। কিন্তু সব নক্ষত্রকে ঘুরতে বা চলতে দেখি না এজন্য যে, তা ঠিক উত্তর মেরুবিন্দুর সোজা উপরে রয়েছে।

www.pathagar.com

কোনো ঘুর্ণায়মান চাকার ব্যাস যদি ৩ হাত হয় আর সে চাকার এক প্রান্তে যদি একটা লাল কাপড় বেঁধে দেন তাহলে দেখবেন সে চাকা যখন ঘুরবে তখন লাল কাপড়টা একবার ৩ হাত উপরে উঠছে আর একবার ৩ হাত নিচে নামছে। কিন্তু চাকার ঠিক মধ্যবিন্দুতে যদি (যে রডের মাথায় আটকা থেকে চাকাটা ঘুরছে) একটা লাল দাগ দিয়ে দেন, তবে যতই চাকা ঘুরান না কেন, ঐ লাল দাগ উঁচুও হবে না, নিচুও হবে না।

ধ্রুবতারা যেহেতু ঘুর্ণায়মান পৃথিবীর মধ্যবিন্দু বা মেরুদণ্ডের সোজাসুজি উপরে তাই পৃথিবীর কোনো স্থান থেকেই তাকে নড়তে-চড়তে দেখা যায় না। ঠিক যদি উত্তর মেরুবিন্দুর উপর কেউ দাঁড়িয়ে দেখতে পারে তবে সে দেখবে ধ্রুবতারা ঠিক তার মাথার উপরে। আর উত্তর আয়নের ৬ মাসের মধ্যে যদি সেখানে গিয়ে কেউ দেখে, তবে দেখবে সূর্য তার মাথার চারপাশ দিয়ে দিগন্তরেখা বরাবর শুধু ঘুরছে। ২৪ ঘণ্টায় একবার সূর্য ঘুরে আসবে আর ঘুরতে থাকবে অনবরত ছয় মাস ধরে।

পৃথিবী ঘোরার কারণেই আকাশের তারকাগুলিকে একটা থেকে অন্যটার দূরত্ব কম-বেশি হতে দেখা যায় না। তাই ঢাকা থেকে যেসব নক্ষত্রকে ২৪ ডিগ্রী উপরে দেখি, ঠিক তার নিচুতে অর্থাৎ উত্তর আকাশের নিচুদেশে যেসব তারকা দেখা যায় সেগুলিকে পশ্চিমদিক থেকে পূর্বদিকে যেতে দেখা যাবে। যেমন যে গাড়িটা পশ্চিমদিকে চলছে তার চাকার একপ্রান্তে যদি একটা লাল ফিতা বেঁধে দেন, তবে দেখবেন যখন ফিতাবাঁধা পাশটা চাকার মধ্যবিন্দু থেকে উপরে উঠছে তখনই সে ফিতা পূর্বদিক থেকে পশ্চিম দিকে যাচ্ছে, আর যখনই মধ্যবিন্দু থেকে নিচে নেমে গেছে তখনই ফিতাটাকে পশ্চিমদিক থেকে পূর্বদিকে যেতে দেখা যাবে।

পৃথিবী যেহেতু তার মেরুদণ্ডের উপর ঘোরে এবং মেরুদণ্ড যেহেতু সব নক্ষত্রের সোজাসুজি তাই পৃথিবী ঘোরার সময় দেখা যাবে ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র করে তার চারপাশের প্রতিটি নক্ষত্রই সব নক্ষত্রের সঙ্গে তাদের ব্যাসার্ধ ঠিক রেখে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরে আসতে। এটাই যুক্তি। প্রকৃতপক্ষে দেখাও যায় তাই-ই।

লক্ষ্য করে দেখবেন, ধ্রুবতারার খুব নিকটে যে তারকাগুলি রয়েছে তাদের দূরত্ব কখনোই সব নক্ষত্র থেকে কম-বেশি হয় না। পৌষ মাসে ঠিক সন্ধ্যা ৬টায় যে তারকাটাকে দেখবেন ধ্রুবতারার ঠিক ৫ ডিগ্রী উপরে রয়েছে, ভোর ৬টার সময় ঐ তারকাটাকেই দেখবেন ধ্রুবতারার ঠিক ৫ ডিগ্রী নিচে। এদের মধ্যে ব্যাসার্ধের চুল পরিমাণও কম-বেশি হয় না।

www.pathagar.com

লক্ষ্য করে দেখুন এবং পরে এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে বের করুন যে, আকাশের তারকাগুলি যদি ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরে আসতো আর সূর্যসহ সেগুলি ঘোরার কারণেই যদি দিন-রাত হতো তাহলে ধ্রুবতারাকে ডুবতে দেখি না কোন্ যুক্তিতে? আর তার নিকটের তারকাগুলিকে ধ্রুবতারার সঙ্গে ব্যাসার্ধের কম-বেশি হতে দেখি না কোন্ কারণে? এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব খুঁজে বের করুন, তারপরে বলুন যে, পৃথিবী স্থির।

কেউ কেউ বলে থাকেন, পৃথিবী ঘুরলে পৃথিবীর পানি ও মাটি একসঙ্গে গুলিয়ে সব কাঁদা হয়ে যেত। হেলিকপ্টার উপরে উঠে কিছুক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে পরে নামলে পশ্চিমে সরে নামতো–ইত্যাদি অনেক পুরাতনকালের খোঁড়া যুক্তি অনেকে হাজির করে থাকেন। তাদের সেসব যুক্তির অসারতা বুঝতে হলে বুঝতে হবে গতিতত্ত্ব ও গতিশীলতার ধর্ম।

পৃথিবীর চলার পথ বৃত্তাকার নয়, ডিম্বাকার

উপরিউক্ত কথাটা ভূগোলে আছে বলেই আমি বলছি, এটাও আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার উদ্দেশ্য আল্লাহ কত সুকৌশলী এবং তাঁর মেহেরবানী যে কত বিজ্ঞোচিত–এটা বুঝানো। আর এ আলোচনা থেকে এটাও বুঝা যাবে যে, আল্লাহর বিজ্ঞোচিত ব্যবস্থাপনাকে বা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এর কোনো ব্যাখ্যাই কেউ দিতে পারবে না।

আপনারা যারা ভূগোল পড়েছেন তারা দেখেছেন, ভূগোলে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে, সূর্যের চারপাশ দিয়ে একটা ডিম্বাকার পথে পৃথিবী ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় একবার ঘুরে আসে।

সূর্যের চারপাশ দিয়ে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব ঠিক রেখে যদি পৃথিবী ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় একবার ঘুরে আসতো তাহলে পথটা হতো পুরোপুরি গোল। কিন্তু তা না হয়ে তাদের একটা দিককে আপনারা দেখেছেন যেন ডিমের মতো একটা পাশ একটু লম্বামতো। এর কারণ এই যে, পৌষ মাসে পৃথিবী থেকে সূর্যের ব্যবধান ৯ কোটি ৪৫ লক্ষ মাইল দূরে থাকে। অর্থাৎ পৌষ মাসের তুলনায় আষাঢ় মাসে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ৩০ লক্ষ মাইল বেশি হয়। এই বেশি পথটাই একটা ডিমের মতো একটু লম্বা হয়ে গেছে। এই লম্বা হয়ে যাওয়ার কারণেই পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব আষাঢ় মাসে বেড়ে যায় পৌষ মাসের চেয়ে ৩০ লক্ষ মাইল বেশি। এই কারণেই সূর্যের পাশ দিয়ে পৃথিবীকে একই গতিতে চলতে পৌষ মাসের পথ হয়

www.pathagar.com

কম, আষাঢ় মাসের পথ হয় বেশি। সুতরাং কম পথ ঘুরতে সময় একটু কম লাগার কথা এবং বেশি পথ ঘুরতে বা চলতে সময় লাগে বেশি। তাই পৌষ হচ্ছে ২৮ বা ২৯ দিনের এবং আষাঢ় মাস হচ্ছে ৩২ দিনের।

ইংরেজি মাসের দিকে লক্ষ্য করলেও দেখতে পাই ফেব্রুয়ারী মাস হয় ২৮ দিনে, আর জুলাই ও আগস্ট পরপর দুই মাস হয় ৩১ দিনের। এর কারণ, জুলাই ও আগস্ট মাসে পৃথিবী সূর্যের (ডিসেম্বর মাসের তুলনায়) বহু দূর দিয়ে ঘুরে আসতে যে বেশি সময় লাগে সেজন্যই বাংলায় হয় আষাঢ় মাস ৩২ দিনে এবং ইংরেজি মাসের বেলায় জুলাই ও আগস্ট পরপর দুই মাস হয় ৩১ দিনে।

এখন প্রশ্ন হলো কেন এমন হয়? পৃথিবী ডিসেম্বরে কেন থাকে সূর্যের কিছুটা নিকটে, আর জুন-জুলাইয়ে কেন থাকে অপেক্ষাকৃত কিছুটা দূরে?

এর কারণ হচ্ছে এই যে, পৃথিবী জুন মাসের দিকে তার বিষুবরেখার উত্তরে কর্কটক্রান্তির উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। আর পৃথিবীর স্থলভাগের বিরাট অংশটা হচ্ছে বিষুবরেখার উত্তরে। আর বিষুবরেখার দক্ষিণের অল্প কিছু জায়গা বাদে প্রায় সবটুকুই হচ্ছে পানি। আর পৌষ মাসে যখন বেশির ভাগ পানির উপর লম্বভাবে কিরণ দেয় তখন সূর্যের কিরণে মাটি যত তাড়াতাড়ি গরম হয় পানি তত তাড়াতাড়ি গরম হয় না। তাই মেহেরবান আল্লাহ এমন ব্যবস্থা করেছেন যে, সূর্য যখন বিষুবরেখার উত্তরে কর্কট -ক্রান্তিতে লম্বভাবে কিরণ দেয় তখন সূর্যকে পৃথিবী থেকে পৌষ মাসের চেয়ে আরো ৩০ লক্ষ মাইল দূরে নিয়ে যান, যেন তাপটা একটু কম পড়ে। আর যখন পৌষ মাসে পানির উপরে লম্বভাবে কিরণ দেয় তখন সূর্যকে আল্লাহ পৃথিবীর কিছুটা নিকটতর করে দেন, যেন তাপের একটা ভারসাম্য রক্ষা পায়। এর দ্বারা আমরা কয়েক ধননের ফায়দা পেয়ে থাকি। যথা ঃ

১. এর ফলে ঋতুর পরিবর্তন হয় যার কারণে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ধরনের ফলমূল উৎপন্ন হয়।

২. পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ এলাকার মধ্যে তাপের ভারসাম্য বজায় থাকে।

৩. পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ এলাকার কোনো এলাকাই সূর্যের কিরণ পাওয়া থেকে একেবারে বঞ্চিত হয় না।

৪. বিষুবরেখার দক্ষিণেও স্থলভাগ আছে যেমন আফ্রিকার একটা অংশ, অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ ও নিউজিল্যান্ডসহ আরো কিছু অঞ্চল রয়েছে–যেসব

www.pathagar.com

অঞ্চলে পৌষ মাসে সূর্য পৃথিবী অপেক্ষাকৃত নিকটে থাকার কারণে তাপমাত্রা বেশি হওয়ার কথা। কিন্তু ঐসব এলাকায় খুব ঘন বনভূমি রয়েছে অর্থাৎ আফ্রিকার দক্ষিণ অঞ্চল ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যভাগে এত বেশি ঘন গাছপালা এবং তা খুবই উঁচু উঁচু গাছ এবং পাতাগুলিও খুব চওড়া চওড়া, ফলে এই গাছ ও গাছের পাতায় ঐ এলাকার তাপকে কিছুটা হ্রাস করে দেয়। আর ঐসব ঘন বন এলাকায় কোনো লোকবসতি নেই। এজন্যই যদিও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মোট আয়তনের দেড় গুণ বেশি তথাপি সেখানকার অধিবাসী মাত্র ১ কোটি ২৫ লক্ষের মতো। তারা মহাদেশের অভ্যন্তরভাগে বাস করে না, বাস করে সমুদ্রের তীরবর্তী এলাকায়।

পৃথিবী থেকে চাঁদ এবং সূর্যের দূরত্ব যে দুই ধরনের তা বুঝানোর জন্যই আল্লাহ সূরা আর-রাহমানে বলেছেন ঃ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

অর্থ ঃ 'সূর্য ও চন্দ্রের (দূরত্বের) হিসাব দুই ধরনের।

অর্থাৎ পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব বছরে দুই ধরনের হয়। এটা হলো সূর্যের হিসাব। আর চাঁদকে এতটুকু দূরত্বে রাখা হয়েছে যেন তার দূরত্ব কোনো সময় কম-বেশি না হয়। আর তা যদি হতো তাহলে হয় জোয়ার-ভাটার পরিমাণ বেশি হতো আর না হয় কম হতো–যার আলোচনা অন্যত্র করা হয়েছে। যেমন আমার লেখা 'যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব' নামক বইয়ের মধ্যে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল আল্লাহর ব্যবস্থাপনা কত বিজ্ঞোচিত।

গতিশীলতার ধর্ম ও তার ফলাফল

গতিশীলতার ধর্মই হচ্ছে তার সঙ্গে অন্য যা কিছু মিলিত থাকে তার প্রত্যেকটিতে ঐ গতি জড়িয়ে দেয়া। একেই বলে 'গতিজড়তা'। আপনি যখন কোনো গাড়িতে চলতে থাকেন তখন গাড়ি ঠিক যে পরিমাণ গতিশীল হবে, আপনিও ঠিক সেই পরিমাণ গতিশীল হয়ে পড়বেন।

শুধু আপনিই যে গতিশীল হয়ে পড়বেন তা-ই নয় বরং আপনার পকেটে যে কাগজ-কলম, টাকা-পয়সা ইত্যাদি রয়েছে তার প্রত্যেকটির সঙ্গে গতি জড়িয়ে যায়। এটা পরীক্ষা করার একটা সহজ নিয়ম এই যে,

www.pathagar.com

আপনি বাসে কিংবা ট্রেনে চলাকালে একটা ফুটবল গাড়ির মধ্যে আলগোছে রেখে দিন, দেখবেন যতক্ষণ একভাবে গাড়ি চলবে ততক্ষণ বল সেইখানেই পড়ে থাকবে। কারণ যে বেগে গাড়ি ছুটছে সেই একই বেগে বলও ছুটছে। এতে প্রমাণ হয় যে, গাড়ির গতি বলে জড়িয়ে গেছে।

এরপর যদি হঠাৎ করে গাড়ি ব্রেক করে তবে আপনিও সামনের দিকে ঝুঁকে পড়বেন আর আপনার সে বলও সামনের দিকে দৌড় মারবে। কারণ গাড়িকে ব্রেক করা হয়েছে, কিন্তু আপনাকে ও বলকে তো ব্রেক করা হয়নি। ব্রেক গাড়িকে টেনে ধরেছে, ফলে তার গতি কমে গেছে, কিন্তু আপনাকে ও আপনার বলকে যেহেতু কেউ পিছন থেকে টেনে ধরেনি তাই আপনার ও বলের মধ্যে যে গতি জড়িয়ে গিয়েছিল সেই গতিতেই চলছিলেন। হঠাৎ করে গাড়িকে পিছন থেকে টেনে ধরায় আপনি আপনার বলসহ সামনের দিকে দৌড় দিচ্ছেন।

আরেকটা পরীক্ষা করুন। গাড়িতে থাকা অবস্থায় আপনার পকেট থেকে একটা পয়সা বের করুন এবং তা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ুন এবং ঠিক পা সোজাসুজি নিচের দিকে ছেড়ে দিন। দেখবেন, তা ঠিক সোজা নিচে এসে পড়বে। পিছন দিকে সরে পড়বে না।

পয়সাটা যখন হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছেন তখন থেকে নিচুতে পড়া পর্যন্ত যতটুকু সময় লাগবে ততটুকু সময়ে গাড়ি হয়তো ৫ হাত সামনে এগিয়ে গেছে। মাধ্যাকর্ষণ বাঁকাভাবে আকর্ষণ করে না, করে সোজাভাবেই। তবে যেহেতু সে পয়সার সঙ্গে গাড়ির গতি জড়িয়ে রয়েছে তাই সে নিচে নামবে বটে ঠিকই, কিন্তু তাতে যে গতি জড়িয়ে ছিল সেই গতিতে সামনের দিকে চলতে চলতে নিচে পড়বে। এর ফলে যেহেতু পয়সাও যে গতিতে সামনের দিকে ছুটে চলেছে আপনিও সেই গতিতে চলছেন এবং গাড়িও একই গতিতে চলছে বলে পয়সা পিছনে সরে পড়ে না, পড়ে গাড়ির মধ্যে সোজা নিচে।

উক্ত একই কারণে পৃথিবী থেকে কোনো প্লেন যখন উপরে উঠে উড়তে থাকে তখন পৃথিবীর যা গতি তা যেহেতু প্লেনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তাই সে গতি তার থাকবেই, তার উপর নতুন করে সে এক ভিন্ন গতি সৃষ্টি করে। ফলে ঐ প্লেনে তিনটি গতি একসঙ্গে কার্যকর হয়। যথা ঃ

১. পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলে পৃথিবী যেমন প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ২০ মাইল বেগে ছুটছে–এভাবে ছুটেই সে (পৃথিবী) ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় সূর্যের

www.pathagar.com

চারপাশের গোল ডিম্বাকার পথ–যার দুরত্ব ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল+ পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ×২×$\frac{২২}{৭}$ = প্রায় ৬০ কোটি মাইল, একবার অতিক্রম করে–এ গতিটিও প্লেনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।

২. পৃথিবীর দৈনিক গতির ফলে সে যে আপন মেরুদণ্ডের উপর প্রতি ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরে আসে এতে পৃথিবীকে প্রতি মিনিটে ২৫০০ মাইল ÷(২৪×৬০ মিনিট) = প্রায় ১৭ মাইল বেগে পশ্চিমদিক থেকে পূর্বদিকে চলতে হচ্ছে। এ গতিটাও ঐ প্লেনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। এটা বুঝার জন্য নিম্নে আরো একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

একটা ফুটবলকে লাথি মেরে উপরে তুলে দিন, দেখবেন বলের মধ্যে দু'টি গতি সৃষ্টি হয়েছে ঃ ক) বলটি দূরে ছুটে চলেছে, খ) বলটি ঘুরতে ঘুরতে যাচ্ছে।

পৃথিবীর অবস্থাও তাই। বার্ষিক গতির ফলে সে দূরে ছুটে চলছে, আর দৈনিক বা আহ্নিক গতির ফলে ঘুরতে ঘুরতে যাচ্ছে। গতিজড়তার কারণে পৃথিবীর এই দুইটি গতি পৃথিবীর প্রতিটি জিনিসের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। এমনকি এর উপরকার বায়ুমণ্ডল ও শূন্য জায়গায়ও এ দু'টি গতি জড়িয়ে রয়েছে। তাই ঐ প্লেনের সঙ্গে ঐ দু'টি গতি তো জড়িয়ে রয়েছেই, উপরন্তু ৩. সে নিজে (প্লেন) চলে যে গতি সৃষ্টি করেছে সে গতিটাও তার মধ্যে রয়েছে। তাহলে বুঝা গেল যে, ঐ প্লেনে ৩টি গতি কার্যকর রয়েছে। সুতরাং পৃথিবীর গা ছেড়ে প্লেন উপরে উঠলে সে মহাশূন্যে হারিয়ে যায় না।

এর প্রমাণের জন্য আপনি আরো একটা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। এ পরীক্ষাটা যদি নিজে করে দেখতে পারেন তবে গতিজড়তা সম্পর্কে আর কোনো অস্পষ্টতা থাকবে না।

একখানা দ্রুতগামী প্লেনে চলতে চলতে (যে প্লেনটা ঘণ্টায় হাজার মাইল বেগে চলছে) আপনি পিছনের কোনো এক সিট থেকে আপনার সামনে ৫ হাত দূরে যে ব্যক্তি বসে আছেন তার নিকট একটা দিয়াশলাইয়ের প্যাকেট ছুঁড়ে দিন, দেখবেন জমিনে বসে ছুঁড়ে দিলেও ঐ প্যাকেটটা যত সময়ে ৫ হাত সামনে গিয়ে পড়বে ঠিক প্লেনের মধ্যেও তত সময়ে ৫ হাত সামনে গিয়ে পড়বে। প্লেনের ভিতরে আপনি যেখান থেকে ঐ প্যাকেটটা ছুঁড়ে দিয়েছিলেন যদি সে জায়গাটা পদ্মা নদীর পূর্ব পাড় হয় তবে ঐ দিয়াশলাইয়ের প্যাকেটটা পশ্চিমাভিমুখী প্লেনের মধ্যে ৫ হাত সামনে যেতে যেতে প্লেনটা পদ্মা নদী পার হয়ে পশ্চিম পাড়ে চলে যাবে।

www.pathagar.com

কিন্তু প্লেন থেকে নয়, জমিনে দাঁড়িয়ে পদ্মার পূর্ব পাড় থেকে পশ্চিম পাড়ের দিকে ঐ প্যাকেটটা ছুঁড়লে তা কস্মিনকালেও নদী পার হবে না।

পুনরায় আপনি পরীক্ষা করুন। প্লেনের সামনের সিট থেকে পিছনের সিট ৫ হাত দূরে ঐ প্যাকেটটা ছুঁড়ে দিন, দেখবেন, মাটিতে দাঁড়িয়ে ছুড়লে ঠিক যতটুকু সময়ে এবং যে গতিবেগে ঐ প্যাকেটটা পশ্চিমদিক থেকে পূর্বদিকে যেত ঠিক প্লেনের মধ্যে সেটা ঐ একই গতিবেগে পশ্চিমদিক থেকে পূর্বদিকে অর্থাৎ পশ্চিমাভিমুখী প্লেনের পিছন দিকে যাবে। কিন্তু এখানেও যদি আপনি পদ্মার পূর্বপাড় থেকে ঐ প্যাকেটটা পূর্বদিকে ছুড়ে দেন, তবে সামনে থেকে ৫ হাত পিছনে পূর্ব দিকে আসতে আসতে প্লেনটা পদ্মা নদী পাড়ি দিয়ে পশ্চিম কূল ধরবে।

তাহলে আপনি যা ছুড়লেন পিছন দিকে তা ৫ হাত পিছনে যেতে যেতে প্রকৃতপক্ষে সামনে চলে যাবে প্রায় ১ মাইল।

কিন্তু সবাই হয়তো প্লেনে উঠে এ পরীক্ষার সঙ্গতি রাখেন না। সুতরাং আপনাকে আরো সহজ পথ বলছি। আপনার চলন্ত ট্রেনের একটা কামরায় লম্বালম্বিভাবে (ভিতরে) দু'জন লোক দাঁড়ান। এর একজন আরেকজনের নিকট একটা ভলিবল ছুঁড়ে দিন, দেখবেন চলন্ত গাড়িতে সে বল সামনের দিকেও যেভাবে যে গতিতে চলবে, পিছনের দিকেও সেই একই গতিতে চলবে। আবার পাশাপাশিভাবে ছুড়লেও ঐ বল ঠিক সামনের লোকটার নিকট চলে যাবে। বল পিছনে সরে গিয়ে পড়বে না। প্লেনের পরীক্ষা ও ট্রেনের পরীক্ষা একই ফল দেবে।

এটা যে কারণে হয় ঐ একই কারণে প্লেনটা উপরে উঠে গেলে পৃথিবী তাকে রেখে বা প্লেনটাকে মহাশূন্যের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে নিজে দূরে সরে পালাতে পারে না।' সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার! হে আল্লাহ! তুমি কি মহান। এজন্যই আল্লাহ তুমি বলেছো–'যালিকা তাকদীরুল আযীযিল আলীম'–উহা মহাশক্তিশালী (মহাজ্ঞানী আল্লাহ)-এর নির্ধারিত ব্যবস্থা।' এখানে 'উহা' অর্থ চাঁদ ও সূর্য এবং পৃথিবীর চলার এই নিয়ম-পদ্ধতি বুঝানো হয়েছে।

এজন্যই তো আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেছেন–'ইন্না ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়াখতিলা ফিল লাইলি ওয়ান্নাহারি লা আয়াতিল্লি উলিল আলবাবা।' অর্থাৎ 'আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকৌশল এবং দির ও রাতের পরিবর্তন (ঋতুর পরিবর্তন) এসবের মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য বহু কিছু (চিন্তা করে বুঝার মতো) নিদর্শন রয়েছে।'

www.pathagar.com

পৃথিবীর গতিজড়তার ফলে আরো একটি ব্যাপার ঘটে, তাহলো এই যে, চাঁদ পৃথিবীর সঙ্গে ছোটে। পৃথিবী ঠিক যে গতিবেগে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টায় প্রায় ৬০ কোটি মাইল পথ অতিক্রম করে, সেই গতিতে চাঁদও পৃথিবীর সঙ্গে থাকে। এটাকে বুঝার জন্য আরেকটি প্রমাণ নিন।

আপনি দ্রুতগামী গাড়িতে চলতে চলতে জানালা দিয়ে বাইরে থুথু ফেলে দেখুন, থুথুটা গাড়ির সঙ্গে কিছু দূর এগিয়ে যাবে, পরে প্রায় ১ হাত বা দেড় হাত দূরে গিয়ে বাতাসের ঝাপটায় হঠাৎ পিছন দিকে দৌড় দিবে। এ থেকে প্রমাণ হলো যে, আপনার মুখের থুথুর মধ্যেও ঐ গতি জড়িয়ে ছিল, সেহেতু সে তার গতি ঠিক রেখেই জানালা দিয়ে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। পৃথিবীর (বার্ষিক গতি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ২০ মাইল) এ গতিটা ছোট-খাট গতি নয়। সুতরাং পৃথিবী যখন প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ২০ মাইল বেগে দৌড়ায় তখন পৃথিবী তার পার্শ্ববর্তী চাঁদকেও গতিজড়তার কারণে সঙ্গে টেনে নিয়ে চলে। এই চলার সময় যে ব্যবধান রেখে চলে সেটাকে বুঝার জন্য আল্লাহ বলেছেন–'সূর্য কখনো চাঁদের নাগাল পায় না এবং চাঁদও কখনো সূর্যের নাগাল পায় না (আল-কুরআন)।'

তা পাবে কি করে? আল্লাহর এমন চমৎকার বিজ্ঞোচিত ব্যবস্থা যে, তার নির্ধারিত ব্যবস্থার বাইরে কাউকেই সরে নড়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। এজন্যই তো আল্লাহ পাক বলেছেন–'আশশামসু ওয়াল কামারু বিহুসবান'–চাঁদ ও সূর্যকে একটা নির্দিষ্ট হিসাবের মধ্যে রাখা হয়েছে।

পৃথিবীর দুই মেরু অঞ্চলের অবস্থা

পৃথিবীতে যদি সূর্যের কিরণ না আসতো তবে পৃথিবী সর্বক্ষণই বরফে ঢাকা থাকতো। কোনো নদী-নালা ও সমুদ্রের পানি তরল অবস্থায় থাকতো না, থাকতো জমাটবাঁধা বরফ অবস্থায়। আল্লাহ বলেছেন–'সাখখারাশ শামসা....' অর্থাৎ 'সূর্য তোমাদের সেবায় নিয়োজিত।' সে সেবা শুধু আলো দিয়ে নয়, তাপ দিয়েও। তার তাপ অর্থ এ নয় যে, পৃথিবীর জমাটবাঁধা পানিকে তরল করে দিচ্ছে, আমাদেরকে শীত থেকে বাঁচাচ্ছে বা ঐ ধরনের কিছু কিছু উপকার করে দিচ্ছে। বরং পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা জানা গেছে যে, তার মধ্যে প্রাণ রক্ষাকারী ভিটামিন ডি-ও রয়েছে। সূর্যের কিরণ ছাড়া পৃথিবীর একটি প্রাণীও বাঁচতে পারে না, এমনকি কোনো গাছ-পালা, লতা-পাতাও বাঁচতে পারে না। পানির মধ্যে (আটকা পানিতে) কিছু

www.pathagar.com

শ্যাওলা জাতীয় গাছ যা দেখা যায় তা-ও সূর্যের কিরণ থেকে প্রাণ রক্ষাকারী ভিটামিন সংগ্রহ করে। সূর্যের তাপ পানির মধ্যেও প্রবেশ করে।

সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়ালা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আকবার! আল্লাহ যে সূর্যের দ্বারা আমাদের কত উপকার করছেন বান্দাহর কি সাধ্য আছে যে তা বুঝে উঠতে পারে।

এই তাপ যখন লম্বভাবে আসে তখন কম বায়ুস্তর ভেদ করে আসে বলে গরম পড়ে বেশি। আর যখন তির্যকভাবে আসে তখন বহু বায়ুস্তর ভেদ করে আসে বলে (বায়ুতে তাপ বাধাপ্রাপ্ত হয়) গরম আর বেশি থাকে না, কিছুটা কমে যায়। এজন্য পৌষ মাসে শীত, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে গরম। বিষুবরেখার ৫ ডিগ্রী উত্তরে ও ৫ ডিগ্রী দক্ষিণে সারাবছরই গরমকাল। ঐ অঞ্চলে যাদের বাস তারা এ কথা বোঝে না যে, মানুষ কি করে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে পারে।

আবার যাদের বসবাস বিষুবরেখা থেকে ৪৭ ডিগ্রী থেকে বেশি উত্তরে বা দক্ষিণে তারা এ কথা বোঝেই না যে, মানুষ কি করে খালি গায়ে থাকতে পারে।

পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে কখনোই সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয় না। বহু বায়ুস্তর ভেদ করে সূর্যের কিরণ আসে, তাই সে অঞ্চলে তাপ অপেক্ষাকৃত অনেক কম। এজন্য উত্তর বা দক্ষিণ মেরুর দিকে যতই যাওয়া যাবে ততই বেশি ঠাণ্ডা। আর মেরুবিন্দুতে পৌঁছে গেলে তো কোনো কথাই নেই। বার মাসই সেখানে বরফ জমে থাকে। তাই সে অঞ্চলটা মানুষ বসবাসের উপযোগী নয়। উপর-নিচ সম্পর্কে তো পূর্বেই বলা হয়েছে।

উত্তর মেরুবিন্দু থেকে সূর্যকে ৯ চৈত্র উঠতে দেখা যায়। সে ওঠা কিন্তু আমাদের সূর্য ওঠার মতো নয়। সেখান থেকে যেহেতু আমাদের উত্তর দিগন্তরেখাটাই উপর দিক, তাই আমাদের উপরটা সেখানকার দিগন্তরেখা। এর ফলে সেখান থেকে সূর্য উঠতে দেখা যাবে দিগন্তরেখা বরাবর বামদিক থেকে ডান দিকে ঘুরছে আর উঠছে। সূর্যের পুরো অংশটা উপরে উঠতেই হয়তো ২/৩ বার ঘোরা হয়ে যাবে অর্থাৎ ২/৩ দিন লেগে যাবে। এভাবে তিন মাস পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে সাড়ে ২৩ ডিগ্রী উপরে উঠবে অর্থাৎ এই অঞ্চলে (ঢাকা শহর) থেকে ধ্রুবতারাকে যতটুকু উপরে দেখা যায় ততটুকু উপরে উঠতে সূর্যের ৮ আষাঢ় পর্যন্ত সময় লেগে যাবে। পরে ১০ আষাঢ় থেকে অল্প অল্প করে ঘুরতে ঘুরতে নিচের দিকে নামতে দেখা যাবে। এরপর ৯

www.pathagar.com

আশ্বিন পর্যন্ত একেবারে দিগন্তরেখার উপর এসে সূর্য পৌঁছে যাবে। তারপর ১০ আশ্বিন সূর্য আড়াল হয়ে যাবে।

ঠিক ঐদিনই দক্ষিণ মেরু থেকে সূর্যকে উঠতে দেখা যাবে। ডানদিক থেকে বামদিকে ঘুরতে ঘুরতে সূর্য উঠতে থাকবে। ৮ পৌষ পর্যন্ত সাড়ে ২৩ ডিগ্রী উপরে উঠবে, পরে ঘুরবে আর নামবে। এভাবে ৮ চৈত্র পর্যন্ত সূর্য দক্ষিণ মেরুতে ডুববে আবার উত্তর মেরুতে উঠে পড়বে। এভাবে সূর্য ওঠা ও ডোবার কারণে সেখানে ৬ মাস দিন ও ৬ মাস রাত থাকে।

বায়ুর একটা ধর্ম আছে। বায়ু ঠাণ্ডা হলে সংকুচিত হয়ে যায় অর্থাৎ অনেক বায়ু অল্প জায়গার মধ্যে এসে পড়ে। আর যখন বায়ু গরম হয় তখন সম্প্রসারিত হয় অর্থাৎ অল্প বায়ু অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য কড়া পাম্প দেয়া সাইকেল রৌদ্রে রাখলে তা ব্রাস্ট হয়ে যায়। কারণ তাপে টিউবের ভিতরের বায়ুর আয়তন বেড়ে যায়, তখন আর টিউবের ভিতরে ঐ বাতাস ধরে না, তাই ফেটে বের হয়ে যায়।

আবার বাতাস যখন গরম হয় তখন বাতাস ছড়িয়ে যায়। এই বাতাস জলীয় বাষ্প ধরে রাখার ক্ষমতা পায়। বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকলে সে বাষ্পে কারো কাপড় ভিজবে না এবং সে পানি দেখাও যাবে না যে কি করে তা বায়ুর সঙ্গে মিশে রয়েছে। কিন্তু বায়ু যদি ঠাণ্ডা হয়ে সংকুচিত হয়, তবে অনেকখানি জায়গার বায়ু অল্পের মধ্যে চলে আসে। তখন বায়ু আর জলীয় বাষ্প ধরে রাখতে পারে না যেমন ভিজা কাপড়ে যে পানি থাকে তা নিংড়ালে ঐ কাপড়ের মধ্যে আর থাকতে পারে না, বের হয়ে যায়।

তেমনি বায়ু ঠাণ্ডা হলে অনেক জায়গার বায়ু অল্পের মধ্যে এসে পড়ে বলে সে বায়ু মোচড়ানোর মতো সংকুচিত হয়। সুতরাং জলীয় বাষ্প আর সে ধরে রাখতে পারে না, তা ছেড়ে দেয়। তখন কুয়াশা পড়ে। কুয়াশার যে পানি তাতে আপনার জামা-কাপড় ভিজবে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যখন সূর্যতাপে বায়ু গরম হয়ে উঠবে তখন কুয়াশার ঐ পানি আবার বায়ুর মধ্যে ঢুকে পড়বে। আমরা তখন বলি, কুয়াশা কেটে গেছে।

এই যদি হয় বায়ুর অবস্থা তাহলে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর বায়ুর অবস্থাটা কেমন হওয়ার কথা? সেখানে যেহেতু কোনো সময়ই সূর্য মাথার উপর আসে না শুধু পাশ দিয়ে ঘোরে তাই বায়ু সেখানে চিরকালই ঠাণ্ডা থাকে। সুতরাং সে বায়ুতে যে জলীয় বাষ্প থাকে তা সর্বক্ষণই কুয়াশায় পরিণত হয়ে থাকে। সেখান থেকে পরিষ্কার আকাশ কখনোই দেখা যাওয়ার কথা নয়। হ্যাঁ, যখন সূর্যটা ঘুরতে ঘুরতে সাড়ে ২৩ ডিগ্রী উপরে আসে তখন কুয়াশা অপেক্ষাকৃত কিছুটা হালকা হয়। এই হলো মেরু

www.pathagar.com

প্রদেশের অবস্থা। আর মেরুবিন্দু থেকে 'পূর্ব' ও 'পশ্চিম' বলে কোনো দিক নেই। উত্তর মেরুবিন্দু থেকে যেদিকেই ফিরে দাঁড়াবেন ঐ দিকটাই দক্ষিণ দিক। আর দক্ষিণ মেরু থেকে হবে তার বিপরীত।

অনেকে প্রশ্ন করেন, ৬ মাস যেখানে দিন আর ৬ মাস যেখানে রাত সেখানে গিয়ে রোযা থাকবো কি করে?

উক্ত প্রশ্নের উত্তর এই, সেখানে কেউ বসবাস করতে পারবে না। যাওয়াটাও খুব সহজ ব্যাপার নয়। যদিও কয়েকবারের উপর্যুপরি চেষ্টার ফলে এবং গোটাকয়েক জীবন বরফের ফাটলে চিরতরে হারিয়ে ফেলার পর কেউ সেখানে যেতে পারেও, তবে সে সেখানে মুসাফির। তাকে রোযা থাকতে হবে না। আর নামায পড়বে ওয়াক্ত পেলে, নইলে নয়।

তবে হ্যাঁ, এমন একটা অঞ্চল আছে যাদের দেশ মেরুবিন্দু থেকে ৩০/৩৫ ডিগ্রী দূরে। সেখানে লোকবসতি খুব পাতলা। এস্কিমোরা বাস করে। তাদের সেখানে জুন মাসের দিকে ২২ ঘণ্টা দিন আর ডিসেম্বর মাসে ২ ঘণ্টা দিন থাকে। ঐখান থেকে জুন মাসে যেহেতু মাত্র ২ ঘণ্টা রাত (সূর্য পশ্চিম-উত্তর কোণে আড়াল হওয়ার ২ ঘণ্টা পরেই আবার উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে সূর্য বেরিয়ে পড়ে), সুতরাং সেখানে এশার নামাযের ওয়াক্ত হয় না, তাই সেখানে এশার নামায পড়া লাগবে না।

কিন্তু উক্ত অবস্থা সেখানে প্রায় ২ মাসের মতো থাকে। এরপরে রাত বড় হলে এশার নামায পড়তে হবে। এটাই হচ্ছে শরীয়তের মাসয়ালা। তাহলে বুঝলেন, শরীয়ত মেরু অঞ্চল সম্পর্কে বে-খবর নয়।

পৃথিবীর ২ মেরু অঞ্চল গোল নয়, চ্যাপ্টা। প্রায় কিছুটা কমলা লেবুর মতো। তাই উত্তর মেরুর কাছাকাছি অঞ্চল অর্থাৎ প্রায় ২৬/২৭ ডিগ্রীর মধ্যে যেসব এলাকা সেইসব এলাকা থেকে মধ্যরাতে সূর্য দেখা যাবে। কারণ পৃথিবীর উপরি ভাগটা সমান হলে সূর্যটা ২৭ ডিগ্রী এলাকা থেকে ৮ পৌষ ৩ ডিগ্রী জমিনে আড়াল দিয়ে ঘুরে আসবে। কিন্তু গোল না হলে যদি কমলা লেবুর মতো হয় তাহলে জমিন সর্বত্র ৩ ডিগ্রী আড়াল করবে না। মেরুবিন্দুর প্রায় ১৩ মাইল চাপা অঞ্চল পর্যন্ত সূর্যের আলো আরেকবার দেখা যাবে। ঐ সময়টাই সেখানে মধ্যরাত। এ কারণেই এ অঞ্চলকে 'নিশিথ সূর্যের দেশ' বলা হয়।

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উত্তরে অবস্থিত হেমারফেস্ট শহর হলো এই নিশিথ সূর্যের দেশ। দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের কোনো নিকটবর্তী এলাকায় কোনো স্থলভাগে হেমারফেস্টের মতো কোনো লোকবসতি এলাকা নেই। সুতরাং দক্ষিণ পাশে কোনো 'নিশিথ সূর্যের দেশ' নেই।

www.pathagar.com

উপর ও নিচ-এর হাকীকত

'উপর' ও 'নিচ' সম্পর্কে আমাদের ধারণাটা কিন্তু ঠিক 'ধারণা' নয়। আমরা মনে করি, আমাদের মাথার দিক যেটা সেটাই 'উঁপর' আর পায়ের তলার দিকটা 'নিচ'। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। পৃথিবীর একটা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে, ঐ শক্তি পৃথিবীপৃষ্ঠের প্রত্যেকটি জিনিসকে এমনকি বায়ুকেও নিজের দিকে আকর্ষণ করতে থাকে। ঐ আকর্ষণে যে জিনিসকে যে পরিমাণ নিজের দিকে টানতে থাকে ঐ পরিমাণটাই হলো তার ওজন। এখানে যার ওজন ৫০ কেজি, হিমালয়ের চূড়ায় উঠলে তার ওজন ৫০ কেজির চেয়ে কম হয়ে যাবে। এমনকি উপরে উঠতে উঠতে যদি এমন এক স্থানে পৌঁছা যায় যেখান থেকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আর আকর্ষণ করতে না পারে তখন সেখানে গেলে একটা মানুষ শূন্যের উপর ভেসে থাকবে। কোথাও সে পড়ে যাবে না। পড়ে যাওয়ার অর্থই হলো মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাকে টেনে নামিয়ে নিয়ে আসে।

রকেটে করে মানুষ চাঁদে গেলে যেখান থেকে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি শেষ হয়ে যাবে আর চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি শুরু হবে, এমন স্থানে রকেটের যাত্রীদের নিকট মনে হবে যেন হঠাৎ পা-টা উপর দিকে এবং মাথাটা নিচের দিকে হয়ে যাচ্ছে। তখন তাকে উল্টে বসতে হবে এবং তখন থেকে সে দেখবে চাঁদ আর উপরে নেই, নিচে দেখা যাচ্ছে। আর পৃথিবী নিজে নেই, উপরে উঠে গেছে। চাঁদের মাঝখানে নামলে পৃথিবী থেকে দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে দেখা যাবে যেন যারা চাঁদে নেমেছে তাদের পা উপরের দিকে এবং মাথা নিচের দিকে। আর যারা চাঁদে রয়েছে তারা দেখবে চাঁদ পায়ের তলে ও পৃথিবী সোজা মাথার উপরে। কারণ চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাকে চাঁদের দিকে আকর্ষণ করে। এজন্য চাঁদের উপর নামলে চাঁদের বিপরীত দিককেই 'উপর' মনে হবে।

পৃথিবীর ব্যাপারও তাই। গোল পৃথিবীর যে যেখানেই থাকুক না কেন, পৃথিবীর দিকটাকে 'নিচ' মনে হবে এবং পৃথিবীর বাইরের পাশকে 'উপর' মনে হবে। এ কথাটাকে আরো স্পষ্ট করে বললে বলতে হবে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যেদিক থেকে আকর্ষণ করে ঐ দিকটা'উপর, আর যেদিক আকর্ষণ করে সেটা নিচের দিক। তাহলে অবস্থা দাঁড়ালো এই যে, আমেরিকার মানুষ যারা পৃথিবীর বিপরীত পাশে রয়েছে তাদের পৃথিবীর দিকটা 'নিচ' হলে আমাদের হিসেবে তাদের যেটা 'নিচ' আমাদের সেটা

www.pathagar.com

'উপর', আমাদের যেটা 'উপর' তাদের সেটা 'নিচ'। আর জাপান থেকে যেটা 'উপর' আমাদের সেটা 'পূর্বদিক' আর লন্ডন থেকে যেটা 'উপর' আমাদের সেটা 'পশ্চিমদিক'। উত্তরমেরু থেকে যেটা 'উপর' আমাদের সেটা 'উত্তরদিক' এবং দক্ষিণমেরু থেকে যেটা 'উপর' আমাদের সেটা 'দক্ষিণদিক'।

তাহলে বুঝা গেল যে, উপর-নিচ প্রকৃতপক্ষে এক এক এলাকার লোকের নিকট এক এক ধরনের। কিন্তু যারা পৃথিবীর অবস্থান ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখেন তারা বোঝেন যে, দুপুরবেলায় যেমন সূর্য পৃথিবী থেকে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে (উপরে নয়) থাকে ঠিক তেমনি রাতের বেলায়ও সূর্য পৃথিবী থেকে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে (নিচে নয়) থাকে। আলহামদুলিল্লাহ! মহান আল্লাহর কি বিজ্ঞোচিত ব্যবস্থাপনা, যার জন্য পৃথিবীর সব এলাকার মানুষ আমরা জমিনের উপর দিয়ে চলাফেরা করতে পারি। এমন মহাবিজ্ঞ মহা শক্তিশালী আল্লাহকে যারা মানতে চায় না তাদের মতো দুর্ভাগা আর কে হতে পারে?

'মাধ্যাকর্ষণ শক্তি' সম্পর্কে আল-কুরআন

'মাধ্যাকর্ষণ শক্তি' বিষয়টি উদঘাটিত হয়েছে কুরআন নাযিল হওয়ার প্রায় ১২০০ বছর পরে। কিন্তু আল-কুরআনে তা আল্লাহ বলেছেন আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বেই। তিনি বলেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ـ

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে এমনভাবে ধারণ করে রেখেছেন যার ফলে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে পতিত হয় না। (সূরা ফাতির ঃ ৪১)

অত্র আয়াতে আল্লাহপাক যে 'ধারণশক্তি'র কথা বলেছেন সেটাই হচ্ছে আমাদের বাংলা ভাষার 'মাধ্যাকর্ষণ শক্তি'।

পবিত্র আল-কুরআনে অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا ـ

অর্থ ঃ যিনি গোটা জমিনকে তোমাদের জন্য এমন শক্তিসম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা পৃথিবীর যেকোনো অংশেই চলাফেরা করতে পারো, যেন ছিটকে পড়ে না যাও। (সূরা মূলক ঃ ১৫)

www.pathagar.com

এই ধরনের বহু আয়াত আছে যার ভাবার্থ ঐ 'মাধ্যাকর্ষণ শক্তি'।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ ـ

অর্থ ঃ এবং আমি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত বিষয়সমূহ যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছি।

এ আয়াতের মধ্যে অতি সংক্ষেপে এত বেশি কথা বলা হয়েছে যার উপযুক্ত ব্যাখ্যা করতে গেলে শুধু ঐ আয়াতের ব্যাখ্যাতেই বিরাট একখানা গ্রন্থ হয়ে যেতে পারে। সেখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে যার যে গুণ বা শক্তি থাকা উচিত এবং যাকে যেখানে যেভাবে সাজালে বা রাখলে তা যথাযথভাবে সুবিন্যস্ত করা হয় তা আল্লাহ তায়ালা করেছেন। এর মধ্যে শুধু পৃথিবীর 'মাধ্যাকর্ষণ শক্তি'রই ইংগিত নয়, বরং প্রতিটি গ্রহ-নক্ষত্র সবকিছুর কথাই বলা হয়েছে যে, তাদের যাকে যতটুকু শক্তিসম্পন্ন করা উচিত এবং মহাশূন্যের মধ্যে যাকে যেখানে রাখা উচিত আল্লাহ্ তাই করেছেন ও রেখেছেন। আল্লাহর বিজ্ঞোচিত সৃষ্টির মধ্যে এমন ব্যবস্থা বিদ্যমান যে, পৃথিবী থেকে চাঁদের আয়তন ও ঘনফল যে পরিমাণ কম পৃথিবী অপেক্ষা চাঁদের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও সেই পরিমাণ কম।

পৃথিবী যখন ধ্বংস হয়ে কিয়ামত হবে তখন বর্তমান মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সিস্টেম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি যা বর্তমানে রয়েছে তা যখন আল্লাহ কেড়ে নিবেন তখন কি অবস্থা হবে তা বলতে গিয়ে আল্লাহপাক সূরা আন-নাবার ২০ নম্বর আয়াতে বলেছেন, জমিনে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যখন থাকবে না তখন– وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ـ অর্থাৎ 'পাহাড়-পর্বতের অণুগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, ফলে তা ধূলোবালির মতো হয়ে যাবে।' এমনকি আল্লাহ্ বলেছেন যৌগিক পদার্থগুলিও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। ফলে وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ সমুদ্রের পানির অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনও একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, তখন পৃথিবীর মধ্যকার আগ্নেয় তাপের সংমিশ্রণে তাতে আগুন ধরে যাবে।

(আত-তাকবীর ঃ ৬)

আল-কুরআনে এই ধরনের বহু আয়াত রয়েছে যার দ্বারা পৃথিবীতে বর্তমানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অস্তিত্ব এবং পরে কিয়ামতের পূর্বে তা প্রত্যাহার করে নেয়া–এ উভয় অবস্থারই ইংগিত রয়েছে।

www.pathagar.com

বৃষ্টিপাত ও বায়ুপ্রবাহ

বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাত ঘটানো সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ বলেছেন ঃ

اَفَرَءَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ ۔ ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ۔ لَوْنَشَاءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ۔

অর্থ ঃ তোমরা যে পানি পান করো সে পানি আমি কিভাবে বৃষ্টি আকারে মেঘ থেকে নাযিল করি তা কি তোমরা চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছো? তা মেঘমালা হতে তোমরা বর্ষণ করো, নাকি এর বর্ষণকারী আমি? আমি চাইলে একে (পানি) তীব্র লবণাক্ত বানিয়ে দিতে পারি। তাহলে তোমরা শুকরিয়া আদায় করবে না কেন? (সূরা ওয়াকিয়া ঃ ৬৮-৭০)

اَللّٰهُ الَّذِىْ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ۔

অর্থ ঃ তিনি আল্লাহ যিনি বায়ুরাশি প্রবাহিত করেন, তারপর ঊর্ধ্বে মেঘমালা সৃষ্টি করেন। (আল্লাহ বলেন) অতঃপর আমি মৃত জমিনকে জিন্দা করি। (সূরা ফাতির ঃ ৯)

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল বায়ুর মাধ্যমে জলীয় বাষ্প তুলে নিয়ে তা দিয়ে আল্লাহ্ ঊর্ধ্বে মেঘ সৃষ্টি করেন। মেঘের সৃষ্টির ব্যাপারে যে বায়ুর প্রয়োজন রয়েছে তা আল্লাহ বলেছেন আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বেই।

এবার পূর্বের আয়াতে কারিমার উপর কিছুটা আলোচনা করি। সেখানে আল্লাহ মানব জাতিকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করেছেন ঃ তোমরা যে পানি পান করো তার হাকীকত জানো কি? চিন্তা করে দেখো না যে, আমি কোন্ নিয়মে বৃষ্টিপাত ঘটাই এবং চিন্তা করো, সে পানি কি কি উপাদানে গঠিত। আমি ইচ্ছা করলে নোনা পানি বর্ষাতে পারতাম, কিন্তু তা করি না।

উক্ত কথাগুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা চিন্তা করলে কয়েকটা তত্ত্ব উদঘাটন করতে পারি। আল্লাহ যখন আমাদের চিন্তা করতে বলেছেন তখন চিন্তা করে দেখতে পাই বায়ু পানির মতো নয়। পানি ১০ লিটার ধারণক্ষমতার পাত্রে মাত্র ১০ লিটার-ই ধরে। চেপেচুপে তাতে ১১ লিটার

www.pathagar.com

পানি ধরানো যায় না। কিন্তু বায়ু তেমন নয়। একটা পাত্রে যতটুকু বায়ু ধরে সে পাত্রে চেপেচুপে আরো প্রায় ততখানিই বায়ু ধরানো যায়। গাড়ির একটা টিউবের মধ্যে জোর করে প্রায় ২/৩টা টিউবের বায়ু ধরানো হয় বলে গাড়ির চাকা অত বেশি শক্ত হয়ে পড়ে।

বায়ুকে আল্লাহ সম্প্রসারণ ও সংকোচনযোগ্য করে সৃষ্টি করেছেন। শুধু টায়ার-টিউবওয়ালা গাড়ির চাকাকে পাম্প দিয়ে চলনসই করার জন্যই নয় বরং তার মধে আল্লাহ্পাকের আরো একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। আসুন সে উদ্দেশ্য আবিষ্কারের জন্য বায়ুকে আরো কিছুটা পরীক্ষা করে দেখি।

আমরা দেখি, কড়াভাবে পাম্পকরা কোনো সাইকেল রৌদ্রের মধ্যে রাখলে চাকা ব্রাস্ট হয়ে যায়। এর থেকে প্রমাণ হয়, বায়ু গরম হলে তার আয়তন বৃদ্ধি পায়। কম স্থানের বায়ু বহু জায়গা দখল করে বসে।

আরো দেখি, শীতকালে লেপ-কাঁথা মুড়ি দিয়েও ঘুমিয়ে থাকা যায়, কিন্তু গরমকালে মশারীর মধ্যেও ঘুমাতে কষ্ট হয়। অর্থাৎ শীতকালে কাঁথার মধ্যে যতটুকু বায়ু থাকে তা থেকে অক্সিজেন নিয়েই একটা মানুষ বাঁচতে পারে, কিন্তু গরমকালে গোটা মশারীর ভিতরের বায়ুতে যে পরিমাণ অক্সিজেন থাকে তা-ও যেন পর্যাপ্ত নয়। এর থেকে বুঝা গেল শীতে বায়ু সংকুচিত হয়। আল্লাহপাক বায়ুর এ অবস্থা কেন করলেন, আসুন এবার সেটাই পরীক্ষা করে দেখি।

আল্লাহ বলেছেন ঃ لَاٰيَاتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ অর্থাৎ 'যারা চিন্তাশীল ও ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন লোক তাদের জন্য এসবের মধ্যে অনেক কিছু বোঝার মতো নিদর্শন রয়েছে।'

আল্লাহ আরো বলেন ঃ اَفَرَاَيْتُمْ অর্থাৎ 'তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা করে দেখো না।' তাহলে নিশ্চয়ই চিন্তা-ভাবনা করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে বায়ুর ঐ অবস্থা কেন, যে তা গরম হলে অল্প বায়ু অনেক স্থান দখল ও ঠাণ্ডা হলে অনেক জায়গার বায়ু অল্প জায়গার মধ্যে চলে আসে।

পরীক্ষায় ধরা পড়ে, শীতকালের ছোট দিনে আমরা যতখানি সূর্যের তাপ পাই, বড় রাতে সে তাপ ছুটে যায়। এবং দেখা যায় শীতকালে সন্ধ্যারাতে কুয়াশা পড়ে না। পড়ে ভোররাতে। কারণ সূর্য অনুপস্থিত থাকার কারণে তাপ যত বেশি কমতে থাকে বায়ু তত বেশি ঠাণ্ডা হতে থাকে, এতে সন্ধ্যারাতের চেয়ে ভোররাতের বায়ু অপেক্ষাকৃত বেশি ঠাণ্ডা হয়, আর তখনই হয় কুয়াশা। এ থেকে বুঝা গেল, বায়ু উত্তপ্ত হলে তাতে জলীয় বাষ্প ধরে বেশি। আর শীতল হলে জলীয় বাষ্প ধরে রাখতে পারে না।

www.pathagar.com

ফলে বায়ু তার মধ্যকার পানি ছেড়ে দেয়। ভেজা কাপড় চিপলে যেমন তার পানি বেরিয়ে যায় তেমনি বায়ু যত বেশি ঠাণ্ডা হয় তত বেশি চাপ খায়, ফলে বায়ু আর পানি ধরে রাখতে পারে না। পানি যখন ছেড়ে দেয় তখন কুয়াশা হয়ে পড়ে।

পরীক্ষায় আরো ধরা পড়ে, গরমকালে সূর্যের প্রখর তাপের সময় শূন্য মাঠে মাটিতে বসে থাকলে যত বেশি গরম অনুভূত হয় তারচেয়ে বেশ কিছুটা কম গরম মনে হয় যদি একটু উঁচু গাছের ডালের উপর অথবা ৩/৪ তলা দালানের উপরের তলাগুলিতে বসা যায়। এ থেকে বুঝা গেল সূর্যের তাপ জমিনের উপড় পড়লে জমিন গরম হয়ে পড়ে, আর সেই গরমে জমিনের উপরি ভাগটা বেশি গরম হয়। তাই ক্রমান্বয়ে যত উপরে যাওয়া যাবে ঠাণ্ডা অপেক্ষাকৃত তত বেশি।

এই তাপের পরিমাণ পরীক্ষা করে দেখা গেল বায়ু সূর্যতাপে যতটুকু উত্তপ্ত হয় তার শতকরা ১৫ ভাগ হয় সরাসরি সূর্যের তাপে আর শতকরা ৮৫ ভাগ গরম হয় জমিনের তাপে। এ থেকে বুঝা গেল জমিনের কাছাকাছি উপরের অংশটা গরম বেশি, আর অপেক্ষাকৃত কিছুটা অধিক উপরে গরম কম। তাই অধিক উপরের বায়ু বেশি সংকুচিত ও জমিনের নিচের বায়ু অপেক্ষাকৃত সম্প্রসারিত।

আমরা উপরের আলোচনায় দেখেছি গরম বায়ু জলীয় বাষ্প ধারণ করতে পারে, কিন্তু ঠাণ্ডা বায়ু চাপ খায় বলে জলীয় বাষ্প ছেড়ে দেয়। এ থেকে প্রমাণ হলো নিচের বাতাস গরম বলে জলীয় বাষ্প ছাড়ে না, কিন্তু উপরের বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকলে বায়ু ঠাণ্ডা হওয়ার কারণে তা ধরে রাখতে পারে না–ছেড়ে দেয়। ফলে মেঘের সৃষ্টি হয়। এর থেকে আরো বুঝা গেল মেঘ কেন উপরে হয়। জলীয় বাষ্প ধারণক্ষমতা উপরের ঠাণ্ডা বায়ুতে থাকে না। এই কারণেই মেঘ হয় উপরে। আর মেঘের মুল্লুকের বায়ু যখন আরো শীতল হয়ে পড়ে তখন অনেকগুলো পানির কণা একত্রে মিলিত হয়ে যখন একটা পানির ফোঁটা তৈরি হয় তখনি আল্লাহর দেয়া মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ফোঁটাটাকে টেনে মাটিতে নামায়। এভাবেই বৃষ্টিপাত হয়।

তাহলে আল্লাহর দেয়া জ্ঞান দ্বারা চিন্তা করে বৃষ্টিপাতের কারণটা জানা গেল। এখন দেখতে হবে, আল্লাহ কেন এ কথা বললেন যে, لَوْنَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا অর্থাৎ 'আমি ইচ্ছা করলে লোনা পানিও বর্ষাতে পারতাম।'

কুরআনপাকে অন্যত্র বলা হয়েছে–'আমি সমুদ্রে প্রাচীর সৃষ্টি করেছি।'

www.pathagar.com

'লোনা পানি বর্ষাতে পারতাম' আর 'প্রাচীর সৃষ্টি করেছি'–এ কথায় আবিষ্কার হচ্ছে আল্লাহ লোনা পানির মধ্যে মিঠা পানি বাষ্পাকারে তুলে নিয়ে আসেন। তিনি ইচ্ছা করলে লোনা পানিও বর্ষাতে পারতেন। কিন্তু জীবের ক্ষতি হবে তাই আল্লাহ তা করেননি এবং এভাবে লোনা পানি থেকে মিঠা পানি এমনভাবে বের করে আনা হয় যেন একটা বিন্দু পরিমাণও লোনা পানি বাষ্পের মধ্যে স্থান না পায়।

এর থেকে প্রমাণ হলো, লোনা পানি ও মিঠা পানির মধ্যে আল্লাহ এমন প্রাচীর সৃষ্টি করে রেখেছেন যে, সে প্রাচীর ভেদ করে লোনা পানি মিঠা পানির সঙ্গে বাষ্পাকারে উঠে কিছুতেই বায়ুতে মিশতে পারে না। সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার! আল্লাহ কত মহান ও কত বিজ্ঞ যে, এতসব ব্যবস্থাপনার দ্বারা তিনি আমাদেরকে বৃষ্টির মাধ্যমে মিঠা পানি দান করেন এবং وَشَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا অর্থাৎ 'জমিনকে পানি চোষার ক্ষমতাসম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছি', ফলে জমিন সে পানি চুষে নিয়ে মৃত জমিন জিন্দা হয় ও তাতে সৃষ্টি হয় جَنّٰتٍ اَلْفَافًا –'হাজারও ধরনের রং-বেরং-এর গাছপালা ও ফলফুলের বাগিচা।'

আর আমাদের রুজির বিভিন্ন ধরনের খাদ্য, ফলমূল ইত্যাদি শুধু আমাদের খাদ্যই নয়, আমাদের গৃহপালিত পশুদেরও। এ কথাই আল্লাহ কুরআন পাকে এভাবে বলেছেন ঃ

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖ * اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا * ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا * فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا * وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا * وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا * وَّحَدَائِقَ غُلْبًا * وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا * مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ *

অর্থ ঃ এছাড়া মানুষ খানিকটা তার খাদ্যের প্রতি দৃষ্টি দিক। আমি প্রচুর পানি বর্ষিয়েছি ও জমিনকে বিস্ময়করভাবে দীর্ণ করেছি (অর্থাৎ পানি প্রবেশযোগ্য করেছি)। অতঃপর তাতে উৎপাদন করেছি শস্য, আঙ্গুর, তরি-তরকারি, জয়তুন (তৈলবীজ), খেজুর, ঘন সন্নিবেশিত বাগিচা আর রকম-বেরকমের ফল ও উদ্ভিদ, তোমাদের জন্য ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুর জন্য জীবিকার সামগ্রীরূপে। (সূরা আবাসা ঃ ২৪–৩২)

www.pathagar.com

পুনরায় আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ ـ

অর্থ ঃ আমি পরিমাণমতো পানি আকাশ থেকে বর্ষাই এবং জমিনের মধ্যে সে পানিকে ধরে রাখি।

وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ـ

অর্থ ঃ অতঃপর সে পানিকে আমি সরিয়ে নিতেও শক্তি রাখি।

(সূরা মু'মিনুন ঃ ১৮)

অর্থাৎ যথাসময়ে সে পানি শুকিয়ে যায়। আর প্রয়োজন মোতাবেক পানি আল্লাহ ধরে রাখেন।

فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ـ

অর্থ ঃ অতঃপর এর দ্বারা তোমাদের জন্য খর্জুর, আঙ্গুর ইত্যাদি ফলফলাদির উদ্যান তৈরি করি। তোমাদের জন্য তার মধ্যে প্রচুর ফলপুঞ্জ রয়েছে যা তোমরা ভক্ষণ করে থাকো। (সূরা মু'মিনুন ঃ ১৮)

বিদ্যুৎ ও মেঘের ডাক

বৈশাখে বৃষ্টির মধ্যে فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ অর্থাৎ 'অন্ধকার, ঝড়-ঝটিকা, মেঘের তর্জ্জন-গর্জন ও বিদ্যুতের চমক থাকে।' এখানে প্রশ্ন, কেন বিদ্যুৎ এবং কেনইবা ঝড়-ঝটিকা ও মেঘের তর্জন-গর্জন? আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন ঃ আমার সৃষ্টিকৌশল সম্পর্কে চিন্তা করলে মানুষের মন থেকে আপনা হতে এই কথা বেরিয়ে আসবে যে, হে প্রভু! তুমি এর কিছুই বিনা কারণে সৃষ্টি করোনি। যারা আমার সৃষ্টির সবকিছুর উপর চিন্তা-ভাবনা করবে তারা বলবে ঃ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ـ অর্থাৎ 'হে আমার প্রভু, তুমি এর কোনোটাই অযথা সৃষ্টি করো নাই।'

এ থেকে বুঝা গেল কিছুই যখন অযথা সৃষ্টি নয় তখন বিদ্যুৎ, মেঘের ডাক, ঝড়-ঝটিকা এর কোনোটাই খামাখা সৃষ্টি করা হয় নাই। নিশ্চয়ই এর মধ্যে আল্লাহর কোনো রহমত রয়েছে। কিন্তু তা কি? এর জবাবে আল্লাহর চিন্তাশীল বান্দাহদের মগজে ধরা পড়েছে মৃত জমিনকে জিন্দা

www.pathagar.com

করা অর্থাৎ জমিনকে সিক্ত করা ও সঙ্গে সঙ্গে জমিনের মধ্যে উদ্ভিদের খাদ্যের উপযোগী সারেরও ব্যবস্থা করা। তার কারণেই বিদ্যুৎ, মেঘের ডাক ও ঝড়-ঝটিকা। তা বুঝার জন্য আল্লাহ অন্যত্র আরো স্পষ্ট করে বলেছেন ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ـ

অর্থ ঃ এবং এটাও তার নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত যে, তিনি তোমাদেরকে বিদ্যুতের চমক দেখিয়ে ভয়-ভীতি ও আশ্বাস দিয়েছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষিয়েছেন আর সে পানি দ্বারা তিনি মৃত জমিনকে সঞ্জীবিত করে তুলেছেন। আল্লাহর এ ব্যবস্থার মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য বুঝার মতো বহু নিদর্শন রয়েছে। (সূরা রূম ঃ ২৪)

এ আয়াতে আল্লাহ পাক বিদ্যুতের মধ্যে দু'টি জিনিসের কথা উল্লেখ করেছেন। এক নম্বরে বলেছেন, বিদ্যুতের মধ্যে ভয়ের কিছু রয়েছে–তা কি সে বিষয়ে বুদ্ধিমানদেরকে আল্লাহ চিন্তা করে দেখতে বলেছেন। দুই নম্বরে বলেছেন লোভনীয় এবং আশ্বাসেরও কিছু রয়েছে। তা কি রয়েছে সেটাও বুদ্ধিমানদেরকে আল্লাহ চিন্তা করে দেখতে বলেছেন। অতঃপর বুদ্ধিমানরা চিন্তা করে দেখলেন যে, মৃত জমিনকে জিন্দা করার জন্য যেমন পানি দরকার তেমনি গাছের খোরাকও দরকার। বিদ্যুতের মধ্যে কি এমন লোভনীয় সম্পদ রয়েছে যা আল্লাহ বলেছেন তা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। সর্বপ্রথম 'মিঃ ক্যাভেনভিনা' নামক একজন বিজ্ঞানী পরীক্ষা করে দেখে বলেছেন–'যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন বায়ু ও অক্সিজেন একত্রে মিলিত হয়ে নাইট্রোজেন গ্যাস নাইট্রেটে পরিণত হয় এবং তা বৃষ্টিধারার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে জমিনে পড়ে।' তার দ্বারা আল্লাহ পাক يُحْيِ بِهِ الْاَرْضَ –'জমিনকে জীবিত করেন।' যার কারণে কোটি কোটি টাকার সার আমরা বৃষ্টির পানির সঙ্গে পাই। এটাই হচ্ছে বিদ্যুতের মাধ্যমে আল্লাহর দেয়া আশ্বাস ও লোভনীয় জিনিস। অন্যথায় শুধু বৃষ্টি হলে আর তাতে গাছের খাদ্য না থাকলে মৃত জমিন জিন্দা হয় কি করে এবং গাছপালাইবা খায় কি?

এছাড়া বিদ্যুৎ দ্বারা আরো উপকার হয়। জমিনে যে সমস্ত রোগজীবাণু সৃষ্টি হয় তা বিদ্যুতের কারণে বহু মারা পড়ে এবং চলতি বিদ্যুৎপ্রবাহে মানব সমাজের যে কত হাজারো ধরনের উপকার রয়েছে তার তো কোনো পরিসীমাই নেই বলতে হবে। সুতরাং আল্লাহ পাক বলেন ঃ ..... وَطَمَعًا

www.pathagar.com

অর্থাৎ 'এবং তার মধ্যে তোমাদের লোভনীয় কিছু পাওয়ার আশ্বাসও রয়েছে, কি তা বুঝে দেখো যাদের জ্ঞান আছে তারা।'

আকাশের মহাশূন্যের মধ্যে কোটি কোটি টাকা মূল্যের নাইট্রিক এসিড বা নাইট্রোজেন গ্যাস রয়েছে যা বিদ্যুতের চমকে নাইট্রেটে পরিণত হয় এবং তা হয় গাছের খাদ্য। সেগুলিকে বৃষ্টির পানির সঙ্গে মিশ্রিত করে দেয়ার জন্যই আল্লাহ পাক বিদ্যুৎ, মেঘের ডাক ও ঝড়-ঝটিকা দিয়েছেন।

মাটির নিচ থেকে পাম্পের সাহায্যে যে পানি তোলা হয় তাতে বৃষ্টির পানির মতো সার থাকে না। এজন্যই সেচব্যবস্থার মাধ্যমে যেখানে চাষাবাদ হয় সেখানে সার ছাড়া ফসল হয় না, কিন্তু বৃষ্টির পানি দ্বারা যেখানে ফসল আবাদ হয় সেখানে সারের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে অনেক কম। এর কারণ এই যে, বৃষ্টির পানি দ্বারা আল্লাহ মৃত জমিনকে যে জিন্দা করার কথা বলেছেন, সে জিন্দার অর্থ হলো জমিনকে বৃষ্টির পানি ও তৎসহ প্রয়োজনীয় গাছের খাদ্য দিয়ে মাটিকে উর্বর করে তোলা।

বিদ্যুৎ, বিজলী ও মেঘের ডাক একই কারণে সৃষ্টি হয়। বিদ্যু দুই প্রকার। যথা ঃ ১. ধনাত্মক ও ২. ঋণাত্মক।

আকাশে যখন মেঘ করে তখন মেঘের মধ্যে খোদায়ী বিধানে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয়। যখন বিপরীতধর্মী বিদ্যুৎসম্পন্ন দুইখানা মেঘ নিকটবর্তী হয় তখন উভয় মেঘের বিদ্যুৎ একে অন্যকে আকর্ষণ করে। তখন ক্ষণিকের জন্য বিদ্যুৎপ্রবাহমান পথটা বায়ুশূন্য হয়ে পড়ে। অতঃপর যখন বায়ু পুনরায় অতি দ্রুতবেগে শূন্যস্থান পূরণ করে তখন উভয় পাশের বিদ্যুতের সংঘর্ষে বিজলী চমকে ওঠে ও বিকট শব্দ হয়। ঐ শব্দটাই মেঘের ডাক।

যখন স্বধর্মী দুই বিদ্যুতের সংঘর্ষে বজ্রের সৃষ্টি হয় তখন তা মহাশূন্যে মঙ্গলের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু যদি বিপরীতধর্মী বিদ্যুতের সংঘর্ষে বজ্রপাত হয় তবে তা মাটির বিদ্যুতের আকর্ষণে মাটিতে চলে আসে। আসার পথে যদি কোনো উঁচু জায়গা বিদ্যুতে পেয়ে বসে তবে সেই উঁচুস্থান বিদ্যুৎকে আকর্ষণ করে টেনে নেয়। এই বিদ্যুতেই মানুষ বা অন্যান্য প্রাণী প্রাণ হারায়।

বিদ্যুৎ ও আলোর বিচ্ছুরণ এবং আওয়াজ একই সঙ্গে হয়। কিন্তু আলোর গতি যেহেতু প্রতি সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল তাই ালোটা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা চোখ পর্যন্ত চলে আসে আর আমরা তা ফেলি। কিন্তু আওয়াজ যখন বায়ুর মাধ্যমে স্বাভাবিক গতিতে চলে র গতি প্রতি ৫ সেকেন্ডে ১ মাইল। বিজলী যখন চমকাতে দেখি াই আওয়াজ শুনতে পাই না, শুনি কিছুক্ষণ পরে। যখন মেঘ খুব

www.pathagar.com

তর্জন-গর্জন শুরু করে দেয় তখন বিজলী চমকাতে দেখলেই মানুষ মনে মনে ভাবে যে, এইবারের আওয়াজে নাকি জানটা শেষই হয়ে যায়। কিন্তু আলোটা যদি কেউ একবার চোখে দেখে ফেলতে পারে তবে নিশ্চিত হতে পারে যে, এবারের ডাকে তার ঘাড়ে বজ্রপাত হচ্ছে না। যে বারের ডাকে মানুষ মরে সে ডাকের আওয়াজ তার কান পর্যন্ত পৌছার কয়েক সেকেন্ড পূর্বেই আলোর গতিতে বিদ্যুৎ এসে তাকে স্পর্শ করবে আর সঙ্গে সঙ্গে তার রূহটা আযরাইলের হাতে চলে যাবে।

অর্থাৎ বুঝা গেল যে, যে বারের বিদ্যুতে কোনো একটা মানুষ তার চোখ থেকে মগজ পর্যন্ত পৌছার পূর্বেই বিদ্যুৎ তার জীবনটা কেড়ে নিয়ে যায় তাকে আওয়াজের অপেক্ষায় ভীত-সন্ত্রস্ত হতে হয় না মোটেই।

বিদ্যুতের হাত থেকে বাঁচার উপায়

যখন মেঘের তর্জন-গর্জন শুরু হয়ে যায় তখন ভয়ের আশংকা করলে সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির ভিতর থেকে কোনো ঘরে আশ্রয় নিতে হবে। পানি বিদ্যুৎ পরিবাহী, তাই পানির মধ্যে থাকলে বিদ্যুৎ আকর্ষণ করার ভয় আছে। আশ্রয়ের কোনো সুযোগ না মিললে নিকটে কোনো বড় উঁচু গাছ থাকলে তার থেকে ৩০/৪০ হাত দূরে সরে দাঁড়াতে হবে। কারণ ৩০/৪০ হাত দূরে বড় গাছ থাকলে খোদার কুদরতে ঐ গাছই সে বিদ্যুৎকে আকর্ষণ করবে। সুতরাং তার কিছু নিকটে বাজ পড়বে না।

আর মাঠের মধ্যে নিকটে কোনো বড় গাছ যদি না থাকে, তবে কমপক্ষে নিজে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে না। অবশ্য মাটিতে শুয়ে পড়া ভালো। রাবারের জুতা কিংবা কাঠের খড়ম যদি পায়ে থাকে আর গায়ের কাপড়-চোপড় ভেজা না থাকে এবং মাটির বা পাকা ঘরের মধ্যে থাকে তবে বজ্রাঘাতে মানুষ মরার সম্ভাবনা অনেকখানি কম হয়।

জোয়ার-ভাটা

সবকিছুই আল্লাহ করেন, কিন্তু প্রত্যেকটি কাজই একটা নিয়মের ভিতর দিয়ে হয়ে থাকে। তালাগাছে তাল আল্লাহই দেন বটে, কিন্তু আল্লাহর এটা নিয়ম নয় যে, তিনি বেলগাছে তাল ধরাবেন। ঠিক তেমনি জোয়ার-ভাটা একটা নিয়মের মাধ্যমে হয়ে থাকে। সে নিয়মটা হলো চাঁদের আকর্ষণ। চাঁদের আকর্ষণ বেশি বলেই জোয়ার-ভাটার কারণ সম্পর্কে চাঁদের আকর্ষণের কথাই বলা হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

কিন্তু কম হলেও সূর্যের আকর্ষণও জোয়ার-ভাটার উপর কিছুটা কার্যকর রয়েছে। যার ফলে অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময় সূর্য এবং চাঁদ যথাক্রমে একই দিক থেকে এবং একে অন্যের বিপরীত দিক থেকে আকর্ষণ করে বলে অমাবস্যা-পূর্ণিমায় জোয়ার-ভাটা হয় অপেক্ষাকৃত তীব্র।

আর যখন চাঁদ ও সূর্য বাঁকাভাবে পৃথিবীকে আকর্ষণ করে তখন জোয়ার-ভাটা তীব্রতর হয় না। চাঁদ পৃথিবীকে যখন আকর্ষণ করে তখন পানি যেহেতু তরল তাই পানি চাঁদের দিকে কিছুটা এগিয়ে যায়। পানি এগোয় বেশি আর পৃথিবী এগোয় কম। এর ফলে চাঁদ যেদিক থেকে আকর্ষণ করে সেদিকে হয় জোয়ার আর পৃথিবীও যেহেতু কিছুটা এগিয়ে আসে তাই অন্য পাশের পানি কিছুটা ঝুলে পড়ে। অর্থাৎ মনে করুন চাঁদ বঙ্গোপসাগর বরাবর উপরে আছে। এখন বঙ্গোপসাগরের পানি চাঁদের দিকে অতিরিক্ত ১০ হাত এগিয়ে গেল। তাহলে সেখানে যদি পানির গভীরতা ৪০ হাত থেকে থাকে তবে আরো ১০ হাত বেড়ে হলো ৫০ হাত।

তবে পানি তরল বলে চাঁদের দিকে ১০ হাত এগিয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু পৃথিবী কঠিন বলে চাঁদের দিকে ১০ হাত এগোয়নি, এগিয়েছে মাত্র ৫ হাত। তাহলে পানি যে ১০ হাত এগিয়ে আসলো তার সঙ্গে যেহেতু পৃথিবীও ৫ হাত এগিয়েছে তাই পানির গভীরতা সেখানে ৫০ হাত না হয়ে ৫০-৫=৪৫ হাত হবে। তাহলে জোয়ারের কারণে পানি ৫ হাত বাড়লো ধরতে হবে। ঠিক সেই সময় বঙ্গোপসাগরের প্রতিপাদস্থল বা তার ঠিক বিপরীত দিকে দক্ষিণ আমেরিকার চিলির নিকটবর্তী স্থানে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে ধরুন সেখানেও পানির গভীরতা ছিল ৪০ হাত। পৃথিবীকে চাঁদ আকর্ষণ করে চিলির বিপরীত দিকে অর্থাৎ বাংলাদেশের দিকে টেনে নিয়েছে ৫ হাত। তাহলে চিলির অবস্থা হলো এই যে, পানির উপরটা ঠিকই রয়েছে, কিন্তু নিচের মাটি আরো ৫ হাত নিচের দিকে সরে গিয়েছে। তাহলে তার ফল দাঁড়ালো এই যে, সেখানে পানির গভীরতা ছিল ৪০ হাত, তার উপর বেড়ে গেল আরো ৫ হাত। তাহলে বলতে হবে ঐ স্থানেও তখন জোয়ারে পানি বেড়েছে ৫ হাত। আর এই সময় ভাটা হবে বাংলাদেশ যত ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমায়, (চিলির দিক থেকে সেই ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমায়) এবং বাংলাদেশের ৯০ ডিগ্রী পশ্চিমে, লন্ডনের এবং ৯০ ডিগ্রি পূর্বে জাপানের নিকটবর্তী স্থানে। এভাবেই জোয়ার-ভাটা হয়ে থাকে।

এভাবে জোয়ার-ভাটা হওয়াটাই আল্লাহর বিধান। চাঁদ যেমন ক্রমে ক্রমে সরে পশ্চিম দিকে যায় তেমনি জোয়ার-ভাটাও চাঁদের সঙ্গে সরতে

www.pathagar.com

থাকে। আজ বেলা ১০টায় যেখানে জোয়ার আগামীকাল সেখানে জোয়ার আসবে ততটুকু দেরিতে যতটুকু দেরিতে আজ অপেক্ষা আগামীকাল চাঁদ উঠবে। অর্থাৎ আগামীকাল ১০টা ৫৬ মিনিটে সেখানে জোয়ার আসবে। কারণ চাঁদ প্রতিদিন ৫৬ মিনিট দেরিতে ওঠে।

সৌরজগৎ

এক কথায় সূর্যের জগৎকে 'সৌরজগৎ' বলে। সূর্য যতদূর পর্যন্ত কিরণ বিস্তার করে এবং যেসব গ্রহ-উপগ্রহ সূর্য থেকে কিরণ পায় তাদের সবাইকে নিয়ে সূর্যের যে জগৎ তাকে বলে 'সৌরজগৎ'।

সৌরজগতের মধ্যে রয়েছে (সূর্যকে কেন্দ্র করে) ৯টি গ্রহ ও তাদের কয়েকটি উপগ্রহ এবং গ্রহাণুপুঞ্জ। সম্প্রতি 'ভালকান' ও 'এক্স' নামে আরো দু'টি গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে, তবে তাদের পুরো তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি। যে ৯টি গ্রহের বিবরণ ইতিপূর্বে পাওয়া গিয়েছে তা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১. বুধ ঃ সূর্যের সর্বাপেক্ষা নিকটতম গ্রহ। এর ব্যাস ৩০৩০ মাইল বা ৪৮৪৮ কিলোমিটার প্রায়। এর বছর হয় ৮৮ দিনে। এ গ্রহ সূর্য থেকে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। এর কোনো উপগ্রহ নেই।

২. শুক্র ঃ এর ব্যাস ৭৭০০ মাইল বা ১২৩২০ কিলোমিটার প্রায়। সূর্য থেকে দূরত্ব ৬ কোটি ৭০ লক্ষ মাইল। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব ২ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল। এটাই পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ। একে আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে দেখায়। একে আমরা 'শুকতারা' বলি। এর বছর হয় ২২৫ দিনে। সুতরাং একে ২২৫ দিন পূর্ব আকাশে 'প্রভাতীতারা' হিসেবে দেখি এবং ২২৫ দিন পশ্চিম আকাশে 'সন্ধ্যাতারা' হিসেবে দেখি।

পৃথিবীর বছর অর্থাৎ ৩৬৫-এর সঙ্গে ২২৫ সংখ্যার কোনো ভগ্নাংশের মিল নেই। তাই ঐ তারা কোন মাসে কোন আকাশে দেখা যাবে তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। প্রতিবছরই ব্যবধান হয়। এরও কোনো উপগ্রহ নেই।

৩. পৃথিবী ঃ এর বিবরণ পরে দেয়া হয়েছে। চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব ২৩৯০০০ মাইল। এর ব্যাস ২১৬০ মাইল বা ৩৪৫৬ কিলোমিটার প্রায়। আয়তন পৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগ। এর বিবরণও পরে দেয়া হয়েছে।

৪. মঙ্গল ঃ এর ব্যাস ৪২৩০ মাইল বা ৬৭৬৮ কিলোমিটার প্রায়। সূর্য থেকে দূরত্ব ১৪ কোটি ২০ লক্ষ মাইল। ৬৮৭ দিনে এর বছর হয়।

www.pathagar.com

এর দু'টি উপগ্রহ আছে। গ্রহাণুপুঞ্জ, মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মাঝে ৩৫ কোটি মাইল ব্যবধানের মধ্যে অন্যকোনো গ্রহ নেই। এই বিস্তীর্ণ মহাশূন্যের মধ্যে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক আছে। তাদের ব্যাস উর্ধ্বে ৫০০ মাইল, নিম্নে ১ মাইলেরও কম। এরা একটি অন্যটির কাছাকাছি দলবদ্ধভাবে আছে বলে এদের সমষ্টিকে 'গ্রহাণুপুঞ্জ' বলা হয়।

৫. বৃহস্পতি ঃ সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ। এর ব্যাস ৮৬৭০০ মাইল বা ১৩৮৭২০ কিলোমিটার প্রায়। সূর্য থেকে দূরত্ব ৪৮ কোটি ৩২ লক্ষ মাইল। আমাদের ১১ বছর ৩৩৫ দিনে এর এক বছর হয়। কিন্তু বৃহস্পতির এক দিন-রাত মাত্র ৯ ঘণ্টা ৫৩ মিনিটে (আমাদের যেখানে ২৪ ঘণ্টায়)। এর উপগ্রহ ১২টি।

৬. শনি ঃ ১০ মাইল পুরু ৩টি উজ্জ্বল বলয় দ্বারা পরিবেষ্টিত এই গ্রহটি এক অতি আকর্ষণীয় গ্রহ। সূর্য থেকে এর দূরত্ব ৮৮ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল। সাড়ে ২৯ বছরে এর এক বছর। এর ব্যাস ৭১০০০ মাইল বা ১১৩৬০০ কিলোমিটার প্রায়। উপগ্রহ ১০টি।

৭. ইউরেনাস ঃ ব্যাস ৩২০০ মাইল বা ৫১২০ কিলোমিটার প্রায়। সূর্য থেকে দূরত্ব ১৭৮ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। আমাদের ৮৪ বছরে এর এক বছর হয়। ১০ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে এর ১ দিন। অর্থাৎ সে তার মেরুদণ্ডের উপর দিয়ে ১ বার ঘুরে আসে ১০ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে। এর উপগ্রহ রয়েছে ৫টি।

৮. নেপচুন ঃ ব্যাস ২৮০০ মাইল বা ৪৪৮০ কিলোমিটার প্রায়। সূর্য থেকে এর দূরত্ব ২৭৮ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। আমাদের ১৬৫ বছরে এর এক বছর হয়ে থাকে। ১৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিটে এর ১ দিন। এর উপগ্রহ ২টি।

৯. প্লুটো ঃ ব্যাস ৩৬০০ মাইল বা ৫৭৬০ কিলোমিটার প্রায়। সূর্য থেকে দূরত্ব ৩৬৭ কোটি মাইল। ২৪৮ বছরে এর এক বছর হয়। এর কোনো উপগ্রহ নেই।

লাখো প্রশংসা আল্লাহ তোমার! মানুষের কি সাধ্য আছে যে তোমার ব্যবস্থাপনা বুঝতে পারে। তুমি যতটুকু জ্ঞান মানুষকে দিয়েছো তার দ্বারা যা বোঝা সম্ভব মানুষ তাই বোঝে। তারচেয়ে বেশি বোঝার কোনোই ক্ষমতা মানুষের নেই। সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার!

www.pathagar.com

পৃথিবীর বেড় ও আয়াতন ঃ মাপার উপায়

পৃথিবীর বেড় ঃ পৃথিবীর বেড় বা পরিধি ২৫ হাজার মাইল বা ৪০ হাজার কিলোমিটার প্রায়–এ কথাটা অনেকেই জানেন। কিন্তু কি করে তা মাপা সম্ভব সে সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এমন লোকের সংখ্যা বাংলাদেশে তত বেশি নয়। আমি বেশ কিছু শিক্ষিত লোকের সঙ্গেও আলাপ করে দেখেছি যে, এ সম্পর্কে বেশির ভাগ লোকের ধারণাই অস্পষ্ট। তাই পৃথিবীর বেড় অত্যন্ত সহজভাবে মাপার একটা নিয়ম এখানে উল্লেখ করছি।

পৃথিবীর বেড় কত মাইল তা বিষুবরেখার উপর দিয়ে ফিতা ধরে মাপা সম্ভব নয়। কারণ ফিতা ধরে মাপার জন্য স্থলভাগ সবখানে পাওয়া যাবে না। জাহাজ একটানা এক নির্দিষ্ট গতিতে চালিয়েও তা বুঝা যায়, কিন্তু তেমন কোনো একটানা সোজা পথ নেই। একটি মাত্র পথ খোলা থাকে। তাহলো উড়োজাহাজ যদি একটানা একই গতিতে পৃথিবীকে একবার বেড় দিয়ে ঘুরে আসে তবে তার গতি ও ঘুরে আসার সময় দেখে বলা যেতে পারে বটে, কিন্তু তাতেও ব্যাপারটা সহজসাধ্য হয় না।

এরচেয়েও সহজ পন্থা হচ্ছে এই যে, পৃথিবী গোল হওয়ার ও ঘোরার কারণেই যখন দিন ও রাত হয় তখন তো একটা বিষয় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পৃথিবীর বেড় ২৫ হাজার মাইল হলেও ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরে আসে কিংবা তারচেয়ে কম বা বেশি হলেও ঐ ২৪ ঘণ্টায়ই একবার ঘুরে আসে। কারণ ২৪ ঘণ্টায় দিন ও রাত হয়। আজ বেলা ১২টায়ও সূর্যকে যেখানে দেখি, আগামীকাল ১২টায়ও সূর্যকে সেখানেই দেখা যাবে। তাহলে এর বেড় যতই হোক না কেন, ২৪ ঘণ্টায় যখন একবার ঘোরে এবং এরই কারণে হয় স্থানীয় সময়ের ব্যবধান, আর সে ব্যবধানটা বের করা মোটেই কষ্টকর ব্যাপার নয়।

যেমন আমাদের বাংলাদেশের স্থানীয় সময় যখন সন্ধ্যা ৫-৩০ মিনিট, আমরা (পৌষ মাসে রোযা হলে) তখন ইফতার করি, আর লাহোরে তখন ৪-৩০ মিনিট। অর্থাৎ ইফতারের আরো এক ঘণ্টা বাকি থাকে। এতে দেখা যাচ্ছে পৃথিবী ঘুরে দিন ও রাত হলে পৃথিবীকে ঢাকা থেকে লাহোর পর্যন্ত ১,০৪৫ মাইল পথ অতিক্রম করতে ১ ঘণ্টা সময় লেগে যাচ্ছে। আর এভাবে পৃথিবী মাত্র ২৪ ঘণ্টা ঘুরলেই তার পথ শেষ হয়ে যায়। তাহলে পৃথিবী প্রতি ১ ঘণ্টায় যদি ১,০৪৫ মাইল পথ চলে তবে ২৪ ঘণ্টায়

www.pathagar.com

২৪×১,০৪৫ মাইল পথ চলবে। তাহলে ২৪-কে ১,০৪৫ দিয়ে গুণ দিয়ে যে সংখ্যা হবে, পৃথিবীর উপর দিয়ে সেই কয় মাইল পথই হবে। এতে দেখা যায় ১,০৪৫×২৪=২৪৯৬০ অর্থাৎ প্রায় ২৫ হাজার মাইল পৃথিবীর বেড়। এভাবে অত্যন্ত সহজ পন্থায় পৃথিবীর বেড় কত তা বের করা যায়।

অংকের নিয়মে প্রতিটি গোল জিনিসকে ৩৬০ ডিগ্রীতে ভাগ করা হয়। পৃথিবী গোল, সুতরাং পৃথিবীকেও ৩৬০টি কাল্পনিক ভাগে ভাগ করা হয়। প্রতি ১ ডিগ্রী স্থানের ব্যবধানে ৪ মিনিট সময়ের ব্যবধান হয়। অর্থাৎ প্রতি ৪ মিনিটে পৃথিবী ১ ডিগ্রী পথ অতিক্রম করে। আর বিষুবরেখার উপর দিয়ে প্রতি ১ ডিগ্রী পথ সমান প্রায় ৭০ মাইল বা ১১২ কিলোমিটার। তাহলে দেখা যায় প্রতি ৭০ মাইল পথ অতিক্রম করতে পৃথিবীর যদি ৪ মিনিট সময় লাগে তাহলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যতবার ৪ মিনিট আছে পৃথিবীর উপর দিয়ে ততবার ৭০ মাইল পথ আছে। তাহলেও পথ হয় $\frac{২৪\times৬০}{৪}\times৭০=২৫২০০$ অর্থাৎ প্রায় ২৫ হাজার মাইল। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর বেড় ২৪৯০২ মাইল, তাকে একটা পূর্ণ সংখ্যায় ধরার জন্য ২৫০০০ মাইল বলা হয়। এসব একেবারে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক করে মাপা সম্ভব নয়, তবে অত্যন্ত কাছাকাছি মাপ এগুলি। এই হিসেবে বিষুবরেখার উপর দিয়ে এক ডিগ্রী পথ প্রায় ৬৯ মাইল ৩০৩ গজ ৪ ইঞ্চির কাছাকাছি।

পৃথিবীর আয়তন ঃ পৃথিবীর বেড় যখন সময়ের ব্যবধান ধরে মাপা যায় তখন একটার মাপ পেলে অন্যটার মাপও সহজ হয়ে যায়। গোল জিনিসের আয়তন নিরূপণ করার উপায় হচ্ছে, যেকোনো গোল জিনিসের ব্যাসকে $\frac{২২}{৭}$ দিয়ে গুণ দিলেপরিধি বা বেড় বের হয়। তাকে ৪ দিয়ে গুণ দিলে তার যা ফল হবে তাকে ব্যসার্ধের বর্গ দিয়ে গুণ করলে গোল যেকোনো বস্তুর উপরের ক্ষেত্রফল পাওয়া যাবে।

উক্ত নিয়মে পৃথিবীর আয়তন হবে $\frac{২২}{৭}$ কে পূর্ণ সংখ্যা করলে হয় $৩\frac{১}{৭}$। একে ভগ্নাংশে না ধরে কাছাকাছি মাপ নেয়ার জন্য যদি ৩ ধরি তবে $৩\times৪\times৪০০০^২$ অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসার্ধকেও ৩৯৬২ মাইল না ধরে পূর্ণ সংখ্যায় ৪০০০ মাইল ধরা হলে= ৩×৪×১৬০০০,০০০=১৯ কোটি ২০ লক্ষ বর্গমাইল (আনুমানিক)। এর মধ্যে আনুমানিক ৫ কোটি ৬০ হাজার বর্গমাইল স্থলভাগ আর বাকি অংশ জলভাগ।

www.pathagar.com

পৃথিবীর স্থলভাগ ক্রমেই বাড়ছে। সম্প্রতি হাতিয়ার নিকটবর্তী এক স্থানে ৫০ বর্গমাইলের একটি ভূখণ্ড বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার মধ্যে পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এজন্যই আল্লাহ বলেছেন–'ওয়া ইম্মিন শাইয়িন ইল্লা ইন্‌দানা খাজায়িনুহা ওয়াসা নুনাজ্জিলুহা বি কাদারিম মা'লুম।' অর্থাৎ 'প্রতিটি জিনিসের কোষাগার আমার হাতে। যখন যে জিনিস যে পরিমাণ প্রয়োজন হয় তখন সে জিনিস সেই পরিমাণ আমি দিয়ে থাকি।'

দেখা যায় সত্যিই তিনি তা দিয়ে থাকেন। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা জনবহুল এলাকা বাংলাদেশে যখন জায়গায় অভাব দেখা দিয়েছে তখন আল্লাহ বাংলাদেশকে প্রায় এর সমান আরেকটা বাংলাদেশ দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার। কিন্তু আল্লাহ দিলে কি হবে? আমরা তো আল্লাহর এ অমোঘ বিধানকে উপলব্ধি করছি না। এবং এতে বিশ্বাসও পোষণ করছি না।

আল্লাহ বলেছেন–'ওয়াল আরদা আদায়াহা লিল আনাম।' অর্থাৎ 'তিনি প্রাণীদের বসবাসের জন্য জমিনকে সম্প্রসারণ করেছেন।' তাহলে বুঝা গেল পৃথিবীর স্থলভাগ সব যুগেই একসমান থাকার কথা নয়। লোক যত বাড়বে আল্লাহ স্থলভাগও তত বাড়াবেন।

সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়ালা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। হে আল্লাহ! তুমি কত মহান, কত দয়ালু। তোমারই অনুগ্রহে মানুষ এসব বুঝার মতো জ্ঞান পেয়েছে। হে মহান আল্লাহ! আমরা যদি সত্যিই তোমার উপর ভরসা করতে পারতাম, তবে নিশ্চয়ই আমাদের ও আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের রুজির জন্য কোনোই চিন্তা-ভাবনা করতে হতো না।

পৃথিবীর বার্ষিক গতি

৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় বছর ও লিপইয়ারের হাকীকত

লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, প্রতিটি নক্ষত্রই প্রতিদিন প্রায় ৪ মিনিট পূর্বে উদয় হয়। পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় একবার ঘুরতে গিয়ে প্রত্যহ প্রায় ১ ডিগ্রী করে পথ অতিক্রম করে। এ কারণেই নক্ষত্রগুলিকে প্রত্যহ এক ডিগ্রী এগিয়ে থাকতে দেখি, যার ব্যবধান প্রায় ৪ মিনিট। এ কারণেই প্রতিটি নক্ষত্রকেই প্রায় ৪ মিনিট পূর্বে উদয় হতে দেখা যায়। পৃথিবীর বার্ষিক গতি না থাকলে আজ সন্ধ্যা ৭টায় যে নক্ষত্রকে মাথার উপরে দেখবো তাকে অনন্তকাল পর্যন্ত ঐ সন্ধ্যা ৭টায় মাথার

www.pathagar.com

উপরেই দেখা যেত। কিন্তু তা দেখা যায় না, বরং প্রতিটি নক্ষত্রই ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট পরে তার পূর্বের স্থানে এসে যায়।

এমন হওয়ার কারণ এই যে, সূর্যকে কেন্দ্র করে ৬০ কোটি মাইল পথ অতিক্রম করতে পৃথিবীকে প্রত্যহ যতটুকু পথ অতিক্রম করতে হয় ততটুকু পথের পরিমাণ প্রায় ১ ডিগ্রী। আর যেহেতু ১ ডিগ্রী=৪ মিনিটের ব্যবধান তাই প্রতি নক্ষত্রকেই ৪ মিনিট পূর্বে উদয় হতে দেখা যায়। এটাই পৃথিবীর বার্ষিক গতির প্রমাণ। এবার দেখা যাক ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় পৃথিবী একবার ঘোরে তা কি করে বুঝা যায়।

আপনি যেকোন লিপইয়ারের ফেব্রুয়ারীর শেষ দিন থেকে পুরো ৪ বছর পর্যন্ত একটা পরীক্ষাকার্য চালু রাখুন[২]। পরীক্ষাটা এভাবে করুন, ফেব্রুয়ারীর শেষ দিন ঠিক রাত ৮টায় যেকোনো একটা নক্ষত্রকে আকাশের যেকোনো এক নির্দিষ্ট স্থানে দেখে রাখুন কিংবা লক্ষ্য করুন ঠিক সোজা মাথার উপরে কোন্ নক্ষত্রটাকে দেখা যাচ্ছে। তাকে চিনে রাখুন।

পরের দিন রাত ৮টার ৪ মিনিট পূর্বে ঐ নক্ষত্রের দিকে লক্ষ্য করুন, দেখবেন ৪ মিনিট পূর্বেই সে নক্ষত্রটা ঠিক সোজা মাথার উপরে এসে গেছে। এভাবে সারাবছর দেখতে থাকুন, দেখবেন প্রত্যহ ৪ মিনিট করে পূর্বে উদয় হয়ে পরের বছর ২৮ ফেব্রুয়ারী রাত ৮টায় ঐ তারকাটাকেই দেখে মনে হবে যেন আকাশের পুরো বেড়টা ঘুরে পুনরায় প্রায় মাথার উপর এসে গেছে, কিন্তু সামান্য কিছুটা বাকি রয়েছে। মনে হবে যেন যেটুকু ব্যবধান রয়েছে তা কিছুক্ষণের মধ্যেই পূরণ হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, তা পূরণ হবে বটে, কিন্তু বাংলাদেশ থেকে পূরণ হতে দেখা যাবে না, দেখা যাবে ৬ ঘণ্টা পরে লন্ডন থেকে।

লন্ডনের স্থানীয় সময় ২৮ ফেব্রয়ারী রাত ৮টায় ঐ তারকাটাকেই ঐখান থেকে ঠিক সোজা মাথার উপর দেখা যাবে। ২য় বছর আরো ৬ ঘণ্টা পরে লন্ডনের ৯০ ডিগ্রী পশ্চিমে ওয়াশিংটনের নিকটবর্তী স্থান থেকে

টীকা–২ ঃ এ পরীক্ষা কোনো যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া হবে না। এমন একটা যন্ত্র স্থাপন করুন যার দু'টি স্তরে কিছু দূরে দূরে ২টি প্লেট ফিট করুন এবং ২টিরই মাঝখানে ২টি গোল ছিদ্র করুন এবং কোনো নির্দিষ্ট তারকাকে নির্দিষ্ট সময়ে দু'টি ছিদ্রের ভিতর দিয়ে দেখুন। যখন আপনার দৃষ্টি দু'টি ছিদ্র দিয়ে একই লাইনে দেখা যাবে ঐ সময়টি ঠিক করে রাখুন। এইভাবেই পরীক্ষা করুন, তাহলে পরীক্ষাটা নির্ভুল হবে।

www.pathagar.com

(২৮ ফেব্রুয়ারী রাত ৮টায়) ঐ তারকাকেই দেখা যাবে তাদের মাথার উপর এসে গেছে। ৩য় বছর ঐ তারকাকেই ঐ তারিখে রাত ৮টায় ওয়াশিংটনেরও ৯০ ডিগ্রী পশ্চিমে (৬ ঘণ্টা পর) আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার উপর থেকে ঠিক মাথার উপর দেখা যাবে।

৪র্থ বছরে আপনারা ঢাকা থেকেই দেখবেন ২৮ ফেব্রুয়ারীর পরের দিন ২৯ ফেব্রুয়ারী ঐ তারকা ঠিক সোজা মাথার উপর এসে গেছে। এর থেকেই প্রমাণ হয় যে, পৃথিবীকে সূর্যের চারপাশ দিয়ে একবার ঘুরে আসতে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা সময় লাগে এবং এ কারণেই প্রতি ৪ বছর অন্তর ফেব্রুয়ারী মাস ১ দিন বৃদ্ধি পায়। এটাই লিপইয়ারের কারণ। এসব বিষয়গুলো কাগজের পাতায় লেখা কোনো বই পড়ে শেখা কিন্তু খুব সহজসাধ্য নয়, এসব শিখতে হয় বিশ্বপ্রকৃতির পাতায় লেখা গ্রন্থ পড়ে। এজন্যই কবি বলেছেন ঃ

বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র
নানাভাবে নতুন জিনিস শিখছি দিবা-রাত্র।
এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়
পাঠ্য যে মোর পাতায় পাতায়
শিখছি সেসব কৌতুহলে নেই দ্বিধা লেশ মাত্র।

আফসোস যে, আল্লাহ আমাদের বারংবার বলেছেন–'ফা'তাবির ইয়া উলিল আলবাব।' অর্থাৎ 'হে মস্তিষ্কের অধিকারীগণ! তোমরা চিন্তা-গবেষণা করো।' আর আমরা সেই চিন্তা-গবেষণাকে আমাদের নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছি। সুতরাং আমাদের মগজে আজ অনেক কিছুই ধরা পড়ছে না। কিন্তু এই চিন্তা-গবেষণাকে যারা তাদের জন্য হারাম করে নাই তাদের মগজে আজ বহু কিছুই ধরা পড়েছে, আর আমরা হচ্ছি তাদের ছাত্র। ধন্য আমাদের মস্তিষ্কের আর ধন্য আমাদের ঈমানদারীর!

তাই বলছি, এখনো সময় আছে আল্লাহর দেয়া কুরআনকে নিয়ে চিন্তা-গবেষণার। আল্লাহর অফুরন্ত ভাণ্ডার আমাদের সামনে অবারিত। এ ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হলে কুরআনকে পড়তে হবে, বুঝতে হবে। সাথে সাথে চিন্তা-গবেষণা করতে হবে। তাহলে হয়তো মহাশূন্যই শুধু নয়, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায়ও আমরা অনেক নতুন নতুন তত্ত্ব পাবো। মুসলিম জাতিএ কুরআনকে অবলম্বন করেই আবার জ্ঞান-বিজ্ঞানের শীর্ষে আরোহণ করতে পারবে।

এ দারস্ থেকে আল্লাহ আমাদের মনে সেই অনুপ্রেরণা দান করুন। আমীন! ❐

www.pathagar.com

খন্দকার আবুল খায়ের (র.) বইসমূহ

১. সূরা ফাতেহার মৌলিক শিক্ষা
২. আয়াতুল কুরসীর তাৎপর্য
৩. দ্বীন প্রতিষ্ঠার ধারা
৪. প্রথম মানুষই প্রথম বিজ্ঞানী
৫. কুরবাণীর শিক্ষা
৬. ঈমানের দাবী মু'মিনের পরিচয়
৭. কেসাস অসিয়ত রোজা
৮. অর্থনীতিতে ইসলামের ভূমিকা
৯. ইসলামী দণ্ডবিধি
১০. মি'রাজের তাৎপর্য
১১. পর্দার গুরুত্ব
১২. বান্দার হক
১৩. ইসলামী জীবন দর্শন
১৪. মহাশূণ্যে সবই ঘুরছে
১৫. নাজাতের সঠিক পথ
১৬. ইসলামের রাজদণ্ড
১৭. যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব
১৮. রাসুলুল্লাহ (স.) বিদায়ী ভাষণ
১৯. সূরা ইখলাসের হাকিকত
২০. প্রাকৃতিক দুর্যোগ
২১. মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব
২২-২৩. ইনফাক ও জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহ্
২৪. নামাজের মৌলিক শিক্ষা
২৫. রোজার মৌলিক শিক্ষা
২৬. সুরা কাউসারের মৌলিক শিক্ষা
২৭. ভোট দেব কাকে এবং কেন?
২৮. ইসলামী আইনে কার কি লাভ ক্ষতি?
২৯. শহীদে কারবালা
৩০. সূরা ফালাক ও নাসের মৌলিক শিক্ষা
৩১. সূরা তাকাছুর ও আসরের মৌলিক শিক্ষা
৩২. নারী নেতৃত্বের চলতি ধারা
৩৩. শয়তান পরিচিতি
৩৪. নাগরিকত্ব হরণের পরিনতি
৩৫. দেশ রক্ষা বাহিনীর গুরুত্ব
৩৬. সূরা মূলকের মৌলিক শিক্ষা
৩৭. সূরা ক্বদরের মৌলিক শিক্ষা
৩৮. যুক্তির কষ্টিপাথরে পরকাল
৩৯. রব মালিক ইলাহ্ হিসেবে আল্লাহর পরিচয়
৪০. কোরআনই বিজ্ঞানের উৎস
৪১. আল্লাহর দৃষ্টিতে কে ঈমানদার কে মুশরিক
৪২. ইল্‌ম গোপনের পরিণতি
৪৩. সওয়াল জওয়াব (১-৯)
৪৪. বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে মুসলমান
৪৫. প্রশ্নোত্তরে কুরআন পরিচিতি
৪৬. অমুসলিমদের প্রতি মহাসত্যের ডাক
৪৭. সহীহ্ কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি
৪৮. প্রচলিত জাল হাদীস
৪৯. বাংলাদেশে ইসলাম মৌকিম না মুসাফির
৫০. যুক্তির কষ্টিপাথরে মিয়ারে হক
৫১. ইসলামই বাংলাদেশের মেন্ডেটরির জাতীয় আদর্শ
৫২. ইসলামের দৃষ্টিতে তসলিমা নাসরিন ও আহমেদ শরীফ

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১১ ৯৬৬২২৯
০১৯২৪৭৩৩৮১৫